ঘরে ও বাইরে

অনুভবে সত্যজিৎ

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

...ঠিন্য ?

...রোগের কারণ এই পেটের গণ্ডগোল,
পেটের গোলমাল সারান, আর লিভারের সুরক্ষায় হ...

পেটের গোলমাল সারাতে ও লিভারের সুরক্ষায়

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসু আবিষ্কার
(মাইকেল মধুসূদন একাডেমী পুরস্কৃত)
লিভোসিন - আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক।

ব্যবহার বিধি ঃ

দু-চা চামচ করে লিভোসিন এক গ্লাস অল্প গরম জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে সেবন করুন, যতদিন না-বুক জ্বালা সারে, হজমশক্তি বাড়ে, অম্লরোগ, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, পেটের গোলমাল সারে আর সৌন্দর্য বাড়ে।

লিভোসিন

লিভার করেক্টিভ, কারমিন্যাটিভ
অ্যাপিটাইজার, রেস্টোর‍্যাটিভ-টনিক।

অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারক ঃ
জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ
২৫, ইডেন হস্পিটাল রোড, কলিকাতা-৭৩
ফোন ঃ ২৬-০১৫৬/২৭-০২২৪/৭৭-৭০৭৫/৩৩-৭০২৬

সমস্ত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার নির্মাতাদের সহযোগী সংস্থা Fupiter এর আয়ুর্বেদিক গবেষণার একটি উপহার।

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা

Allen's Ad India

ঘরে ও বাইরে

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

সম্পাদক :
অজিত কুমার

সত্যজিৎ রায়ের স্মরণে বিশেষ স্মৃতি ঃ শ্রদ্ধা সংখ্যা

সম্পাদকীয় কার্যালয় :
২, ছকু খানসামা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ৩৫-০৪৯৪

অর্পণ প্রকাশনীর পক্ষে :
শ্রী অজিত কুমার দাস কর্তৃক
অর্পণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
ছকু খানসামা লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

● সূচীপত্র ●

সত্যজিৎ এর অপর নাম প্রসাদ	আশিসতরু মুখোপাধ্যায়	
সত্যজিৎ রায় অপুর ট্রিলজি এবং...	কমলেন্দু সরকার	
সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে কিছু অকথিত কথা	রামকৃষ্ণ রায়	
বড়ো সাহেব আর নেই	অভিজিৎ বসু	
নিঃশব্দে চলে গেলেন চন্দ্রাবতী	বিশেষ প্রতিনিধি	১১
ঘটনাময় স্মৃতি	স্বপন মল্লিক	১৩
সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রের আবহ সঙ্গীত	সন্দীপ মিত্র	১৫
সত্যজিৎ রিয়ালিজমের সঙ্গে...	সুজন বিশ্বাস	১৭
সত্যজিৎ রায় একটি সত্তা একটি বোধ	চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮
বন্ধু সত্যজিৎ	বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯
মহাপ্রস্থানে সত্যজিৎ রায়	বিশেষ প্রতিনিধি	২২
আমার শিশুকাল	সংকলন	২৩
জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না	সিদ্ধার্থ সরকার	২৪
শব্দজব্দ	মৌসুমী রায়	২৬
ঘরে বাইরে সত্যজিৎ	নীরব রায়	২৭
বিদেশে সাধারণের কাছে সত্যজিৎ চর্চা	অমর বোস	৩২
স্মৃতি : শ্রদ্ধা	অনুলিখনে সমাপ্তি ভট্টাচার্য্য মৌসুমী বসু ও শুভ্রা মল্লিক	৩৫
সত্যজিৎ ছিলেন গ্রেট	রঞ্জন দাসগুপ্ত	৪৫
কবিতা ঃ ইতিহাস সত্যজিৎ	মুক্তি চক্রবর্তী	৪৫

Ghore-o Baire R. N. No. 44146/87 Postal Regn. No WB/BC 330

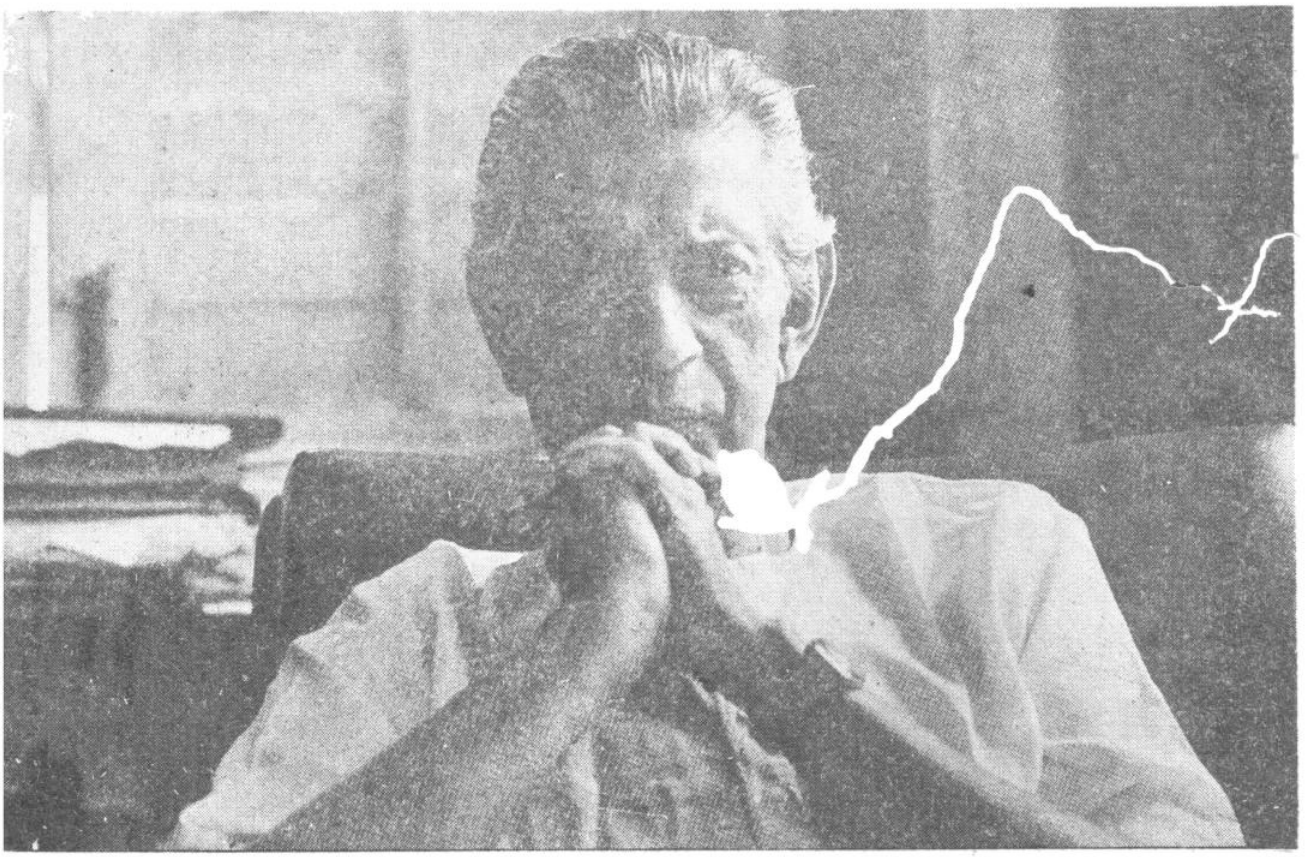

সত্যজিৎ রায় চলে গেলেন। একটা যুগের অবসান হলো। তাঁর আত্মার প্রতি রইলো আমাদের অন্তরসিক্ত শ্রদ্ধা। আমাদের সংকলনে আমরা সচেষ্ট হয়েছি মানুষ সত্যজিৎ অন্তরঙ্গ সত্যজিৎ-অনুভবে সত্যজিৎ রায়কে তুলে ধরতে।

সত্যজিৎ-এর অপর নাম প্রসাদ

আশিসতরু মুখোপাধ্যায়

মানিকদার সঙ্গে আমার শেষ দেখা তাঁর শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এর ইনডোর শুটিংয়ে। ১৯৯০ সালের ২২ নভেম্বর ছিল সে দিনটা। পরিচিত-জনের মানিকদা অর্থাৎ বিশ্ববরেণ্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের কাছে ১৯৯০ সালটা ছিল খুবই স্মরণীয়। কারণ ওই বছরে 'শাখা প্রশাখা' শেষ করে তিনি আবার শুরু করেন 'আগন্তুক' ছবিটা। মনে আছে মানিকদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এর আগে আপনি একই বছরে দুটো ছবি করেছেন কি? ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ছ'নম্বর ফ্লোরে তখন সেটের লাইটিং করছিলেন ক্যামেরাম্যান বরুণ রাহা। মানিকদা চেয়ারে বসেছিল একা। বললেন, বত্রিশ বছর পর আবার ১৯৯০-এর একই বছরে দুটো ছবি করছি 'শাখা প্রশাখা আর 'আগন্তুক'। ১৯৫৮ সালে করেছিলাম 'পরশপাথর' ও 'জলসাঘর'। ওই বছরে 'কাবুলিওয়ালা'-র জন্য বিদেশের চলচ্চিত্রোৎসবে যোগ দিতে যাবেন ছবি বিশ্বাস। তাই ওঁর কাজটা আগে সেরে ফেলার জন্য 'পরশপাথর' শেষ করেই ছবিবাবুকে নিয়ে শুরু করি 'জলসাঘর' একই বছরে।

সত্তর বছরেও কী স্মরণশক্তি ছিল মানিকদার পরে বাগীশ্বর ঝা'র বেঙ্গল মোশন পিকচার ডায়েরিতে চোখ বুলিয়ে দেখি মানিকদা ঠিকই বলেছেন। ১৯৫৮ সালের ১৭ জানুয়ারি রাধা, পূর্ণ, প্রাচীতে মুক্তি পায় 'পরশপাথর' আর ১০ অক্টোবর 'জলসাঘর'। মানিকদা সেটে এলেন দশটা বেজে দশে। পরনে তাঁর রঙিন হাওয়াই শার্ট, প্যান্ট। মেডিকেয়ার সার্ভিসের এক তরুণ ডাক্তার এসে প্রথমেই মানিকদার প্রেসার এবং পালস দেখে বললেন নর্মাল। শিল্পনির্দেশক অশোক বসু সেট ঠিক আছে কিনা তা শেষবারের মত জন্য দেখে নিলেন। মানিকদার ছেলে বাবু (সন্দীপ রায়) একবার তার বাবার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন। সন্দীপ এখন বাবার হয়ে নিজেই ক্যামেরা অপারেট করেন। মেকআপরুমে মেকআপম্যান অনন্ত দাসের কাছে তখনও মেকআপ নিচ্ছিল উৎপল দত্ত আর দীপঙ্কর দে।

মানিকদা কথা বলছিলেন তাঁর বন্ধু মাধব দে'র সঙ্গে। রায় বাড়ির নতুন আগন্তুক অর্থাৎ মানিকদার সদ্যজাত নাতির কী নাম রাখলেন তা জিজ্ঞেস করতে বললেন আমায়, 'আমার নাতির নতুন নামকরণ করে আমায় চিঠি পাঠাচ্ছেন অনেকে। বহু বছরের এক পত্র লেখক আমার নাতির জন্য কয়েকটা নাম লিখে পাঠিয়েছেন। এখনও আমি কোন নাম ঠিক করিনি। মানিকদাকে বলি, আপনাদের বংশে তিন পুরুষের নাম 'স' (সুকুমার সত্যজিৎ ও সন্দীপ) দিয়ে শুরু। আমরা চাই চতুর্থপুরুষেরও নামটা 'স' দিয়েই হোক। আমার কথা শুনে মানিকদা সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললেন, 'আমার বাবা কিন্তু প্রথমে আমার নাম রেখেছিলেন 'প্রসাদ'। আমাদের এক পরিচিতর ওই নামটা থাকায় বাবা প্রসাদের বদলে আমার নতুন নামকরণ করলেন সত্যজিৎ। দেখি 'স'-নামের ট্র্যাডিশনটা বজায় রাখতে পারি কিনা।' মানিকদা পরে তাঁর নাতির নাম রাখেন সৌরদীপ।

এগারটা বাজতেই সেটে ঢুকলেন প্রথমে সাহেবী পোশাকে দীপঙ্কর দে পরে কাজকরা বেগুনিরঙের পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা পরে উৎপল দত্ত। তিনিই অভিনয় করছেন আগন্তুকের চরিত্রে। আর তাঁর এক আত্মীয়র চরিত্রে করছেন দীপঙ্কর দে। ছবির গল্পটা আগেভাগে জানাতে চাইলেন না মানিকদা। শুধু বললেন, 'মূল্যবোধের ওপরই লেখা আমারই কাহিনী। 'শাখাপ্রশাখা'-র বিষয় মূল্যবোধের ওপরে হলেও 'আগন্তুক'-এর অ্যাপ্রোচ একেবারে ভিন্ন স্বাদের।'

মানিকদা এগারটা নাগাদ উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। ঢুকলেন শুটিং জোনে। বনেদি বাড়ির ঘরে এগারটা বেজে দশ মিনিটের সম প্রথম শট নিলেন মানিকদা। ঘরের আলমারি লাগানো আয়নায় যখন উৎপল দত্ত ত পাঞ্জাবীর বোতাম ঠিক আছে কিনা দে নিচ্ছিলেন তখন অফিস থেকে ফিরে হা অ্যাটাচি নিয়ে দরজায় নক করছিলেন দীপঙ্ক 'কাম ইন' বলে দীপঙ্করকে গুড-ইভি জানালেন উৎপলবাবু। আর দীপঙ্কর ঘ ঢোকা মাত্রই 'ও কে' বলে দৃশ্যটা গ্রহণ কর মানিকদা।

দুপুর-একটায় লাঞ্চব্রেক হল। মানিকদা বসে শুকনো খাবার খেলেন, অফিসে তাড়া ছিল বলে আর অপেক্ষা করল মানিকদাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে অফিসে। দু'বছর পর মানিকদাও অ সবাইকে ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন ১৯৯২ ২৩ এপ্রিল। এক মুহূর্তেরও জন্যও পারি না মানিকদা নেই। যাবার বেলা সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে গেলেন। প্রথমে ও পরে 'ভারতরত্ন'। এটা লজ্জার যে পর মানিকদাকে দেওয়া হল স্বদেশের স্ব রবীন্দ্রনাথের বেলায় যা ঘটেছিল সত্যা ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। খুবই দুঃখের।

এটা লজ্জার যে বিদেশের পর মানিকদাকে দেওয়া হল স্বদেশের স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথের বেলায় যা ঘটেছিল সত্যজিতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। খুবই দুঃখের।

সত্যজিৎ রায় অপুর ট্রিলজি এবং

—কমলেন্দু সরকার

শুরুটা একটু আগে থেকেই করা যেতে পারে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তখন বয়স বাহান্ন বছর। শরীর খুব একটা ভাল নয়। সাল ১৯১৪। এই বছর সুকুমার রায়ের বিয়ে দিলেন উপেন্দ্রকিশোর। পাত্রী ঢাকার মেয়ে সুপ্রভা। ওই বছরেই উপেন্দ্রকিশোর উঠে এলেন ১০০ নম্বর গড়পার রোডে। মনের মত করে বানিয়েছিলেন ওই বাড়ি। "সন্দেশ" পত্রিকা বার হচ্ছে তখনও। শরীরে আর কুলোচ্ছে না পত্রিকার ভার দিলেন সুকুমার আর সুবিনয় রায়ের ওপর। সুকুমার রায়ের সম্পাদনায় সন্দেশ বার হতে লাগল।

১৯১৫-র ২০ ডিসেম্বর মারা গেলেন উপেন্দ্রকিশোর। সুকুমার আর সুপ্রভা-র একটি পুত্র সন্তান হল, ১৯২১-র ২রা মে। পুত্রের নাম প্রসাদ। ১৯২৩-র ২ মে এর নামকরণ অনুষ্ঠানে প্রসাদের পরিবর্তে ছেলের নাম রাখা হল সত্যজিৎ। সত্যজিৎ রায়। ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মারা গেলেন সুকুমার রায়, কালাজ্বরে ভুগে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছত্রিশ।

সত্যজিতের বছর পাঁচেক কেটেছে একশো গড়পার রোডের বাড়িতে। ১৯২৫ সালে দেউলিয়া বলে ঘোষিত হল ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স। ১৯২৬ সালে পুত্র সত্যজিৎ-কে নিয়ে সুপ্রভাদেবী চলে এলেন ভবানীপুরের বেলতলায় ভাই প্রশান্তকুমার দাশের বাড়ি। শুরু হল এক নতুন জীবন। সত্যজিৎ রায় সাড়ে আট বছর বয়সে ভর্তি হলেন বালিগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে।

দশ-বারো বছর বয়সেই সত্যজিৎ দক্ষ হয়ে উঠলেন ছবি আঁকায়। সময় চলে যায়। দেখতে দেখতে সত্যজিৎ রায় স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পর চলে গেলেন শান্তিনিকেতন। সেখানে ভর্তি হলেন কলাভবনে। ওখানে মাষ্টার মশায় হিসাবে পেলেন নন্দলাল বসুকে। এখানে শিক্ষা শেষ করে সত্যজিৎ ফিরে এলেন কলকাতায়। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে তিনি কাজে যোগ দিলেন ডি জে কীমার বিজ্ঞাপন সংস্থায়। একসময় তিনি হলেন এই সংস্থার আর্ট ডিরেক্টর। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে এল ছবি তৈরীর কথা। বিলেত গেলেন অফিসের কাজে সত্যজিৎ। সেখানে গিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় একশোটার বেশী ছবি দেখলেন তিনি। আরও প্রবল হল ছবি তৈরীর নেশা। চিত্রনাট্য লেখাও শুরু হল। পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য তৈরী করলেন ঘরে বাইরে উপন্যাসের।

ঘরে বাইরে শেষ পর্যন্ত হল না। সত্যজিৎ রায় শেষ করলেন পথের পাঁচালীর চিত্রনাট্য। ছবির শুটিংও শুরু হল একসময়। এই ছবির জন্য টাকা জোগাড়ের কাহিনী তো আর অজানা নেই। সেই প্রসঙ্গে আর না যাওয়াই ভাল। শিল্পী নির্বাচনও মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে, শুধু সমস্যা অপুকে নিয়ে। কাউকেই আর সত্যজিতের পছন্দ হয় না।

একদিন সত্যজিত রায়ের স্ত্রী বিজয়া রায় ছিলেন তাঁদের লেক অ্যাভিনিউ বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ তাঁর নজরে এল পাশের বাড়ির ছাদে। কয়েকটি বাচ্চা খেলা করছে সেখানে। হঠাৎ বিজয়া রায় চেঁচিয়ে উঠলেন পেয়েছি পেয়েছি বলে। ছুটলেন তিনি। সারা শহর খুঁজে যাকে পাওয়া যায় নি, তাকে পাওয়া গেল পাশের বাড়িতে। ছেলেটির নাম সুবীর ব্যানার্জি। পথের পাঁচালী শেষ হল ১৯৫৫য়ে।

কলকাতায় পথের পাঁচালী মুক্তি পেল ২৬ আগষ্ট ১৯৫৫। যদিও তার আগে ছবিটি দেখানো হয়ে গেছে আমেরিকার নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এ। স্বদেশে তো বটেই, বিদেশেও প্রচণ্ড আলোড়ন তুলল 'পথের পাঁচালী'। এবং ছবিটি দেশে বিদেশে পুরস্কার পেল তেরটি। এরপর ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় ছবি তৈরী করলেন সত্যজিৎ 'অপরাজিত', এবং ১৯৫৯ সালে তৈরি করলেন 'অপুর সংসার'। যদিও ৫৭ আর ৫৮ সালে আরও দুটি ছবি করেছেন সত্যজিৎ রায়—পরশপাথর (১৯৫৮) জলসাঘর (১৯৫৯)।

অপুর সংসার (১৯৫৯) তৈরি করে শেষ হল অপুর ট্রিলোজি। অপুর ট্রিলোজির সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে ডনস্কভের গোর্কি ট্রিলোজির। তবে শেষটি প্রথম দুটির মতো উচ্চমানের নয়। সেদিক দিয়ে অপুর ট্রিলোজি শ্রেষ্ঠ। এই বক্তব্যটি হল প্যাট্রিসিয়া বেতার-এর। এ অপুর ট্রিলোজি যেন একটি লিরিকের মতো, মিষ্ট এক কবিতা। ট্রিলোজির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আত্মজীবনমূলক-ঘটনাস্রোতে জীবনের এক গভীরতায় পৌছন। সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি এই ট্রিলোজি তিনটি ছবিই ভারতের সামাজিক চলচ্চিত্রে এক অসামান্য অবদান। এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র জীবনে তিনি তৈরি করেছেন মোট ২৮ টি কাহিনীচিত্র ৫টি তথ্যচিত্র এবং ৩টি দূরদর্শন চিত্র। এছাড়াও চলচ্চিত্রের সমস্ত দিকেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ।

এই কথা আজ প্রমাণিত সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নতুন যুগ এবং ধারার স্রষ্টা। ভারতীয় ছবিতে শিল্প ধর্ম বড় কথা নয়, সেখানে বিরাট হল জনপ্রিয় এবং নামী-দামী তারকা। সত্যজিৎ রায় ভেঙে দিয়েছেন সেই ট্র্যাডিশন। শুধু আমাদের দেশে নয়, বাইরের দেশের অনেক বিখ্যাত চলচ্চিত্রে সমালোচকের মতে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন যুগের স্রষ্টা। তাঁর ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন অনেক পরিচালকই দেশে এবং বিদেশে।

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে কিছু অকথিত কথা

রামকৃষ্ণ রায়

সত্যজিৎ রায় বিদায় নিলেন এই মহাবিশ্ব থেকে। তার কীর্তি তো বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের কাছ থেকেই তাঁর বিদায় নিতে হোল তাঁকে। বিশ্ব তাঁকে আঁকড়ে রেখেছিল একাত্তরটি বছর কিন্তু বাহাত্তরের জন্ম তারিখটি পর্যন্ত তাঁকে আটকে রাখতে পারল না। মৃত্যু কাউকে ছাড়ে না, বিশ্বমাতৃকার ক্রোড় থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল নির্মমভাবে সত্যজিৎ রায়কে।

মৃত্যুর পর সব মানুষেরই পূর্ণচ্ছেদ। কিছু মানুষ আছেন যাদের নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে মিশে যাবার পরও তার অস্তিত্ব থেকে যায়। অধিকাংশ মানুষকেই স্মরণে রাখা যায় না কিন্তু ওই বিরল প্রতিভাদের স্মরণে রাখা যায়। সত্যজিৎ রায় সেই বিরলতম মানুষদের একজন। সেখানেই তাঁর অমরত্ব। অমরদের তো মৃত্যু নেই।

সত্যজিৎকে তুলনা করা হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের যে সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, তাই নাকি ছিল সত্যজিতের। পোড়া বঙ্গদেশ, পোড়া ভারতবর্ষ আগে সে গুণাপণার ছিটে ফোঁটাও টের পায়নি। টের পেয়েছে বহু পরে। রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিৎ দুজনের ক্ষেত্রেই। যখন টের পেয়েছে তখন দুজনেই বিশ্ববন্দিত হয়ে গেছেন। ওঁদের চিনতে পেরেছে যখন 'আনল মালা জগৎ জিনে।'

প্রতিভাবানরা চিরকালই থাকে অবহেলিত প্রথম দিকে সত্যজিতের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কেউ মারা যাবার পর তার অনেক কথাই মনে পড়ে তখন, তারপর সব কিছুই বুঝি হারিয়ে যায়। সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবনের অনেক কথাই অনেকের মনে গেঁথে রেখে গেছেন। তিনি সত্যজিৎ রায় বলেই। তাই হারায়নি। কেউ সে সব কথা বার করেছেন, কেউ করেন নি। তাঁর সম্বন্ধে তবু বহু কথা জানা হয়ে গেছে কিন্তু এমন অনেক কথাও আছে যা কারো জানা নেই। এই মুহূর্তে যেমন আমার সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে এমন কিছু কথা মনে আসছে, যা হয়তো অনেকের জানা নেই। হয়তো বা জানা আছে।

আমি যে সম্পর্কে কথা বলছি তা সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের কাল। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যে একেবারেই যুক্ত ছিলেন না তা নয়, তবে এ সময়টা ছিল পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর আত্মনিয়োগের সময়। প্রতিষ্ঠা অর্জনের থেকে, একটি ব্যতিক্রমী ছবি 'পথের পাঁচালী'কে সম্পূর্ণ করার প্রয়াস ও সংগ্রাম।

'পথের পাঁচালী' স্বপ্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ করতে পারেন নি সত্যজিৎ। অনেক বাধা আর প্রতিকূলতা তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। বিপরীত চিন্তার মানুষদের কাছ থেকে অনেক জ্ঞান, উপদেশ তাঁকে শুনতে হয়েছে। অনেক অসম্মান আর কটূক্তি তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। অনেক ব্যঙ্গোক্তি তাঁর মানসিকতাকে পীড়িত করেছে। তবু তিনি টলেননি, কোথাও কম্প্রোমাইজ করেননি। অবশেষে স্বনামধন্য নাট্যকার মন্মথ রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়কে সম্মত করিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে 'পথের পাঁচালী' সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন সত্যজিৎ। তখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিবেশনার সূত্রপাত করে। ডাঃ রায় 'পথের পাঁচালী'কে

আর্থিক স্বাচ্ছল্য দান করাতে প্রসন্ন ছিলেন না তথ্য কেন্দ্রের তৎকালিন ডাইরেক্টর মিঃ মাথুর। জনশ্রুতি, মিঃ মাথুর নাকি বলেছিলেন, যে ছবিতে গ্রামোদ্যোগ-ট্রামোদ্যোগ বিষয় নেই তেমন ছবির পিছনে টাকা ঢালা নাকি ডাক্তার রায়ের পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

অবাক ব্যাপার, পরবর্তী কালে, উক্ত মিঃ মাথুর সত্যজিৎ রায়ের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি রূপে শ্রেষ্ঠ ছবি 'পথের পাচালী'র পুরস্কার হাত পেতে নিয়ে এসেছিলেন। এতটুকু দ্বিধা বা লজ্জা হয়নি। এসব কথা হয়তো সবার জানা। আমি তখন 'উল্টোরথ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। চিত্র সাংবাদিক রূপেও চিহ্নিত। মনে পড়ছে, 'পথের পাঁচালী' চিত্র মুক্তির আগে প্রচারের জন্যে কিছু স্টিল নিয়ে এসেছিলেন প্রচারসচিব মিঃ গুপ্ত। তখন তাঁর আগমনটা ছিল মিনতিভরা, অর্থাৎ স্টিলগুলো ছাপা হোলে কৃতার্থ হবেন। স্টিলগুলো ছিল ফিল্মের 'গেট' থেকে সরাসরি প্রিন্ট করা, ফলে যথেষ্ট গ্রেন ছিল তাতে। সাধারণত প্রচারের জন্যে ছবির স্টিল আলাদাভাবে তোলা হয়ে থাকে। আমি 'গেট' থেকে প্রিন্ট করা স্টিল সেই প্রথম দেখে ছিলাম।

তখন উল্টোরথ-এর কর্ণধার প্রসাদ সিংহ সেই স্টিল ছাপতে রাজি হন নি। অনেক পীড়াপীড়িতে সেই স্টিল ছাপা হয়, এবং ছাপার পর যে রেজাল্ট পাওয়া যায় তা দেখে প্রসাদ সিং অবাক হয়ে যান।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, 'পথের পাঁচালী' পর্দায় দেখেও প্রসাদ সিংহ খুশি হতে পারেননি। বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এটাই স্বাভাবিক, কেন না গতানুগতিক বাণিজ্যক ছবি দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। অনেকের মতো প্রসাদ সিংকেও তখন বলতে শুনেছি, 'পথের পাচালী'তে উৎকট দারিদ্র দেখিয়ে দেশকে হেয় করা হয়েছে। অথচ পরে সত্যজিৎ রায় তাঁর পর পর কয়েকটি ছবির জন্যে 'উল্টোরথ পুরস্কার' পেয়েছেন। এমন কী উল্টোরথ-এর মতো সিনেমা জগৎ পত্রিকার জন্যে অপুর সংসার-এর কভার লে-আউট করে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় নিজে। পরবর্তী কালে সত্যজিৎ রায় যত বার উল্টোরথ আফিসে এসেছেন প্রসাদ সিংহ তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা আর সম্মান দেখিয়েছেন।

শুধু প্রসাদ সিংহকেই বা বলি কেন, 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' দেখে বাংলার প্রতিটি সংবাদপত্রে, মাসিকপত্রে বিরূপ সমালোচনা তো বেরিয়ে ছিলই দুটো ছবিই যে নিম্নমানের তা বলতেও ভুল হয় নি সবার। বাংলার যে দৈনিক পত্রিকাটি আমৃত্যু সি রায়কে এতদিন তাঁর ইলাস্ট্রেশন আর রচনা প্রকাশ করে মাথায় তুলে রেখেছিল সেই দৈনিকেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ছবির বিরুদ্ধে সমালোচনা।

কিন্তু ব্যতিক্রমী এবং দুঃসাহসিক সমালোচনা ঐ প্রতিষ্ঠানেরই সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখেছিলেন বিভাগীয় চিত্র সম্পাদক ও অতিপ্রাজ্ঞ চিত্রসমালোচক 'শৌভিক' ওরফে প্রয়াত পঙ্কজ দত্ত। একমাত্র তিনিই 'অপরাজিত' ছবি দেখে উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন, এ ছবি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবার যোগ্য।

পঙ্কজ দত্তের দূরদর্শিতা সত্যে পরিণত হয়। অপরাজিত কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্রাঁ পী পায়। তারপরের ঘটনার কথাও আজ মনে পড়ে যাচ্ছে।

পঙ্কজদা উল্টোরথ-এও লিখতেন। প্রতি সপ্তাহে একবার করে আসতেন পত্রিকা অফিসে। সে সময় এ ঘটনার কথা তাঁরই মুখে শোনা।

গ্রাঁ পী পুরস্কার নিয়ে দেশে ফিরে বম্বের বিমান বন্দর থেকে তাঁর আপনজনদের ফোনে জানান যে, দমদম বিমান বন্দরে পঙ্কজ দত্তকে যেন অবশ্যই হাজির রাখা হয়।

যথাসময়ে দমদমে সবাই ভীড় করে উপস্থিত থাকেন। তাঁদের মধ্যেই মিশে ছিলেন পঙ্কজ দত্ত। বন্দরের মাঠে এসে নামল বিমান। সিঁড়িতে দেখা গেল হাসিহাসি মুখে নামছেন ঝোলানো ব্যাগ কাঁধে, একহাতে সুটকেশ আর অন্য হাতে গ্রাঁ পী পুরস্কারের আধার নিয়ে সত্যজিৎ।

নীচে নেমে এগিয়ে আসতেই অপেক্ষমান আপনজন আর পরিচিতরা ছুটে গেল তাঁকে মালা পরিয়ে অভিনন্দন আর সম্বর্ধনা জানাতে। কিন্তু সত্যজিতের সেসবে ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। কাকে যেন উদ্‌গ্রীব চোখে খুঁজছে। অবশেষে দেখা পেলেন তাঁর। আবার মুখে প্রসন্নতা ফিরে এলো। একধারে অভাজনের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাংবাদিক – চিত্রসমালোচক পঙ্কজ দত্ত। কারো দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে এলেন পঙ্কজ দত্তর কাছে। একজনের হাতে সুটকেশ গছিয়ে দিয়ে গলার মালাগুলো সব খুলে পরিয়ে দিলেন পঙ্কজ দত্তের গলায় আর গ্রাঁপীর আধারটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এ পুরস্কার আপনিই পাইয়ে দিয়েছেন। এ আপনারই প্রাপ্য। একমাত্র আপনিই প্রথম বলেছিলেন 'অপরাজিত' পুরস্কার পাবার যোগ্য।

পঙ্কজদার মুখেই সেদিন বলতে শুনেছি, 'জানো রামকৃষ্ণ, ওনার গ্রাঁ পী প্রাপ্তির খবরটা ভোর বেলার কাগজে দেখে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। কেন জানো? সত্যজিৎ বাবু যে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছেন সেই আনন্দে। যা উচিত তাই হয়েছে—দ্য ম্যান হু ডিজার্ভস্ টু গেট্ ইট্।

'পথের পাঁচালী'কে যে পত্রিকাখানি শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মানে পুরস্কৃত করে সত্যজিৎ রায়কে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের মর্যাদা দিয়েছিল নিকুঞ্জ পত্রী সম্পাদিত 'চিত্রিতা' পত্রিকার নাম না করলে অন্যায় হবে। বলা বাহুল্য সেই সম্মানটা বোধ হয় কোনো পত্রিকার তরফ থেকে প্রথম।

সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা ছিল আকাশের মতো সীমাহীন। আমি এক তুচ্ছ ধূলিকণা, তাঁর বিশালতার ব্যাখ্যা করব আমার এমন সাধ্য কী? আমার যেটুকু সাধ্য বললাম মাত্র। কিছু অকথিত কথা, এছাড়া আর কিছু নয়। আমি ওঁকে দেখেছি, কথা বলেছি, মিশেছি—এটুকুই আমার গর্ব।

বড়ো সাহেব আর নেই

অভিজিৎ বসু

নন্দনে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বিশাল জনগন

মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘ সাহসী লড়াই শেষ। বাংলার সত্যজিৎ, ভারতের সত্যজিৎ, পৃথিবীর সত্যজিৎ সকলকে বিষাদ সাগরে ভাসিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। এই হাহাকার, এই শূন্যতা, একাশি বছর আগেকার একটি মৃত্যুঞ্জে মনে করিয়ে দেয়। সেদিন বিদায় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর এইদিন বিদায় নিলেন রবীন্দ্রনাথেরই ভাবশিষ্য সত্যজিৎ রায়। চিত্র জগতের যেন এক ইন্দ্রপতন ঘটে গেল। ১৯৫৫ সালের ২৬শে আগস্টে মুক্তি পেল 'পথের পাঁচালী'। তারপর থেকে দীর্ঘ সাঁইত্রিশটা বছর কেটে গেছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জগতে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে তিনি শুধুই এগিয়ে গেছেন। কোনো সীমানাই তাঁকে স্থানু করতে পারেনি। টালিগঞ্জের মিচেল ক্যামেরা, টালিগঞ্জের ফ্লোর, টালিগঞ্জের আলো, টালিগঞ্জের কলাকুশলী এসব নিয়েই তিনি একের পর এক তৈরী করে গেছেন পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার, পরশ পাথর, জলসাঘর, দেবী, চারুলতা আরো কত কী। সত্যজিতের মহাপ্রয়ানে টালিগঞ্জের নির্জনতা আমাকে জানিয়ে দেয় এখনও তারা শোক সামলে উঠতে পারেনি। তাই ইন্দ্রপুরীতে ঢোকার মুখেই কেমন যেন একটা হোঁচট খেলাম; অদ্ভুতএক। নিস্তব্ধতা বিষাদ ভরা ভায়োলিনের সুর কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে।

আধময়লা পাঞ্জাবী আর খাটো একটা ধুতি পরে বসেছিলেন রামবাবু গেটের কাছেই। কাকে চাই? জিজ্ঞাসা করতে। বললাম—'আপনাকে'। আপনি এখানে কত বছর কাজ করছেন? তা প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল। সত্যজিৎ রায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, তিনি আর আসবেন না, এই স্টুডিওতে এই কথাগুলো চিন্তা করলে আপনার কি মনে হয়? আমি পঁচিশ বছর এখানে আছি বহু মানুষের আনাগোনা এখানে। তবুও তাদের মধ্যে থেকে এক ঝলকেই মানিকবাবুকে আমরা ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমরা বলতে এই এখাকার নীচুতলার কর্মীরা। কারন তিনি দুঃখীর দুঃখ বুঝতেন। এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, দেখুন আমাদের সাথে ওনার যোগাযোগ খুব বেশী না হলেও; আমরা আপনার লোক বলে মনে করতাম মানিকবাবুকে।

তিনি গম্ভীর স্বরে 'কাট্' বলে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠবেন না। আমিও আর আগের মতো মাথায় হাত তুলে সেলাম জানাতে পারব না। বড় অসহায় হয়ে গেলাম। বড় একা হয়ে গেলাম।

এই কথা শুধুই রামবাবুর নয়, একথা সমগ্র বাঙালীর, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের। বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাস থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পতন হল। তিনি শুধু একালের নন, চিরকালের। আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসের এক অধ্যায়।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম, চোখে পড়ল একটি ঘর। একজন মাঝবয়সী লোক বসে আছেন। দেখেই বলে উঠলেন, 'আজ এখানে কাউকে পাবেন না।' 'কেন?'—জিজ্ঞাসা করতেই বললেন আজ সত্যজিৎ বাবুর স্মরণসভা আছে, তাই স্টুডিও ফাঁকা। আপনি যাবেন না স্মরণ সভায়? তাতো যাবোই, তবে এই ঘর ছেড়ে যেতে একদম মন লাগছে না। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে আমি এই ঘর দেখাশোনা করছি। আজ আমাদের বড়ো সাহেব নেই। ভাবলেও যেন বিশ্বাস হয়না কথাটা। আর আমরা তাকে এই চেয়ারেও বসতে দেখব না। আমাদের সামনে দিয়ে আর তিনি লম্বা পায়ে হেঁটে যাবেন না। বুঝলেন বড়ো সাহেব হলেন সাক্ষাৎ ভগবান। না হলে কি আর অত সুন্দর সুন্দর বই সৃষ্টি করতে পারতেন। এই চেয়ার, এই ফোন, জলের গ্লাস, তোয়ালে এখনও আমি ঠিক করে গুছিয়ে রাখি। যদি তিনি হঠাৎ করে কোনসময় এসে পড়েন।

যত শুনছি তাঁর কথা ততই মনটা ভারী হয়ে যাচ্ছে। কি অদ্ভুত ভালবাসা এদের। অফিস ঘরটা একবার দেখলাম। সব যথা স্থানেই আছে। কিন্তু আসল মানুষটিই নেই। এককথায় সত্যজিৎ মানে সত্যজিৎ, আর মানিক মানে মানিক। তাঁর দুই নামই সার্থক।

আমাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার

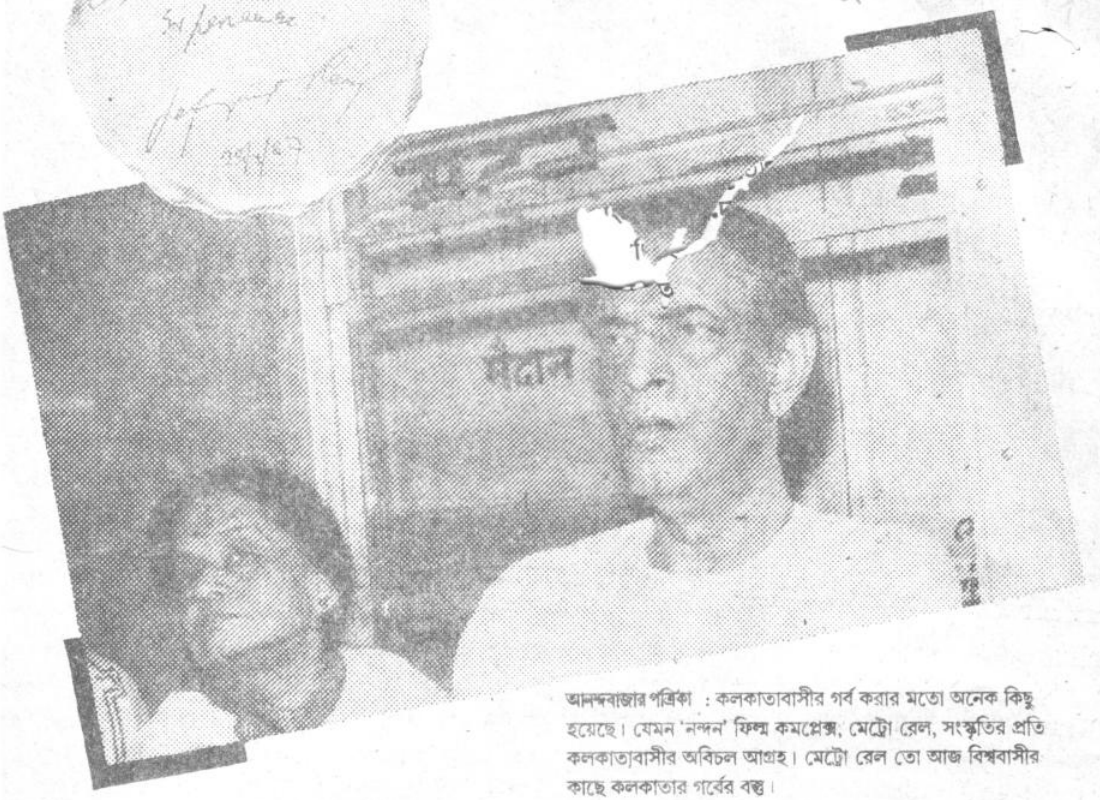

আনন্দবাজার পত্রিকা : কলকাতাবাসীর গর্ব করার মতো অনেক কিছু হয়েছে। যেমন 'নন্দন' ফিল্ম কমপ্লেক্স, মেট্রো রেল, সংস্কৃতির প্রতি কলকাতাবাসীর অবিচল আগ্রহ। মেট্রো রেল তো আজ বিশ্ববাসীর কাছে কলকাতার গর্বের বস্তু।

The Statesman : Then there was the underground – "Impeccably maintained and as good as any Metro in the world."

বর্তমান : "এই কলকাতায় আছে একটি 'নন্দন', একটি পাতাল রেল, তাই এখনও আমরা ছবি করি।"

যুগান্তর মেট্রোরেল। এত সুসজ্জিত এবং সুপরিচালিত পাতাল পথ পৃথিবীর খুব কম শহরেই আছে।

The Telegraph : The Metro Rail, "as good as any underground system in the world,"...

আজকাল : গত আট বছরে কলকাতা গর্ব করার মত পেয়েছে তিনটি জিনিস। নন্দন, মেট্রো রেল আর সাংস্কৃতিক উচ্ছ্বাস...

১১.১.৯০ তারিখে প্রকাশিত সত্যজিৎ রায়-এর ভাষণের অংশবিশেষ

সৃষ্টি অবিনশ্বর

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

I care for you, you care for Metro

DELTA

নিঃশব্দে চলে গেলেন চন্দ্রাবতী

বিশেষ প্রতিনিধি

চন্দ্রাবতী দেবী নিঃশব্দে চলে গেলেন। সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে তিরিশ চল্লিশ দশকের খ্যাতনামা নায়িকা এবং পরের যুগের দক্ষ-চরিত্রাভিনেত্রী চন্দ্রাবতী দেবীর ইহলোক থেকে প্রস্থান কেমন যেন চাপা পড়ে গেল। আকাশবাণী, দূরদর্শন আর খবরের কাগজগুলি কেমন যেন দায়সারা ভাবে খবরটা পরিবেশন করল। অথচ চন্দ্রাবতী দেবী দায়সারা গোছের অভিনেত্রী ছিলেন না। ওরকম অভিজাত অভিনেত্রী বাংলা ছায়াছবিতে খুব বেশি দেখা যায় নি। আভিজাত্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। তিনি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে অভিনয় করে গেছেন। তাই তাঁর অভিনীত চরিত্র চিরন্তনতার দাবি রাখে। আশা ছিল, চন্দ্রাবতী তো ইত্যাদির দলে নন। তাই তাঁর মৃত্যুতে একটা কিছু করা হবে। অবশ্য ধারণা করাটাই ভুল। কেন না আমরা তো আত্মবিস্মৃত জাতি।

চন্দ্রাবতী ছোট বয়সে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথই তাঁর চন্দ্রাবতী নামকরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। শরৎচন্দ্রের স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হননি তিনি। বিহারের মজঃফরপুরে এক ধনী অভিজাত পরিবারে চন্দ্রাবতীর জন্ম। পিতা গঙ্গাধর সাহু ছিলেন জমিদার ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। পড়াশুনা তাঁর ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে। সে যুগের স্নাতক চন্দ্রাবতী বেথুন কলেজে পড়েছেন। তাঁর দিদি কঙ্কাবতী আগেই নাটকে ও চলচ্চিত্রে-নামায় চন্দ্রাবতী অভিনয়ের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হন। তবে দিদির ছায়াছবিতে যোগদেওয়ার ব্যাপারটাকে তাঁর বাবা ভালভাবে নিতে পারেন নি।

চন্দ্রাবতীর প্রথম ছবি নিজের প্রযোজিত নির্বাক 'পিয়ারী'। পরিচালক তাঁরই স্বামী বিমল পাল। মুভি পিকচার্সের এই ছবিটি মুক্তি পায় ১৯২৯ সালের ৬ এপ্রিল। চন্দ্রাবতী দেবীই বাংলা ছবির প্রথম মহিলা প্রযোজিকা। শুধু তাই নয়, তিনি সিনেমা পত্রিকাও বের করেছেন। নাম বায়োস্কোপ।

চন্দ্রাবতী নির্বাকে থেমে থাকেন নি। চারবছর বাদে তাঁকে দেখা গেল সবাক ছবিতে। নিউথিয়েটার্সের হাতি মার্কা ছবির নায়িকা। শিশির কুমার ভাদুড়ী সীতা ছবি করবেন বলে ঠিক করেছেন। তিনি চন্দ্রাবতীকে উর্মিলা চরিত্রে মনোনীত করেন। তার জন্য নিউথিয়েটার্সে মেকাপ টেস্ট দিতে আসেন। সে সময় চন্দ্রাবতী নাচ গান দুটিতেই পারদর্শী। পরিচালক দেবকীকুমার বসু 'চণ্ডীদাসে'র অভাবনীয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সঙ্গীত নৃত্য মুখর ছবি 'মীরাবাঈ' করবেন বলে স্থির করেছেন। 'মীরাবাঈ' এর ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল 'চণ্ডীদাসে' রাণীর ভূমিকানেত্রী উমাশশীর। কিন্তু উমাশশীর শরীর সে সময় ভাল ছিল না। দেবকীবাবু চিন্তায় ছিলেন 'মীরাবাঈ' নিয়ে। চন্দ্রাবতীকে দেখতে ছিল খুব সুন্দর। তারপর নাচগান জানেন। দেবকীবাবু চন্দ্রাবতীকে দেখেই মনোনীত করে ফেললেন। 'মীরাবাঈ' মুক্তি পেল ১৯৩৩ সালের ১১ নভেম্বর চিত্রা সিনেমায়। এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। চন্দ্রাবতী সাড়া জাগালেন তাঁর প্রথম সবাক ছবিতে। নায়ক পাহাড়ী সান্যাল। সে যুগের ম্যাটিনি আইডল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। নাচে গানে দর্শককে মাতিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রাবতী।

পরের বছর 'দক্ষযজ্ঞ' ছবিতে সতী চরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে মুগ্ধ হল কলকাতার চিত্র সাংবাদিকরা। একটি পত্রিকা লিখেই ফেলল "সতীর ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর অভিনয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে।"

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'দেবদাস' ছবি চন্দ্রাবতীকে অনন্য সাধারণ অভিনেত্রীর মর্যাদা দেয়। চন্দ্রাবতী এ ছবিতে নায়িকা নন। কিন্তু নায়িকা না হলেও 'চন্দ্রমুখী' চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করলেন। শরৎচন্দ্র চন্দ্রাবতীকে বলেছিলেন "আমার রচনার চেয়ে অনেক বেশি সতেজ হয়েছে তোমার অভিনয়।" বারবিলাসিনী 'চন্দ্রমুখী' চন্দ্রাবতীর অভিনয় গুণে আমাদের সহানুভূতি আদায় করে নেয়। সে সময়কার সব পত্রপত্রিকা দারুণভাবে প্রশংসা করে 'দেবদাস' ও 'চন্দ্রামুখীর'।

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাস অবলম্বনে 'বিজয়া' ছবিতে বিজয়া চরিত্রে চন্দ্রাবতীর অভিনয় দারুণভাবে মনে দাগ কাটে। পরে এই চরিত্রে সুনন্দা ব্যানার্জি ও সুচিত্রা সেন অভিনয় করেছেন। এই প্রতিবেদকের তিনটি ছবিই দেখার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু চন্দ্রাবতী সবার সেরা। তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের প্রশংসা করে ইংরাজি দীপালি পত্রিকা সেদিন লিখেছিল, Chandrabati gives a very sincere Characterisation of Bijoya the girl who finds love but does not realise it as such till the last. Although lacring in personal Charm, she literally lives the part with a grateful dignity that can not but make a deep impression on the audience."

নিউথিয়েটার্সের দ্বিভাষী চিত্র দিদি (হিন্দিতে প্রেসিডেন্ট) চন্দ্রাবতীর অমর সৃষ্টি। প্রেসিডেন্ট প্রভাবতী চরিত্রে চন্দ্রাবতীর অভিনয় অবিস্মরণীয়। 'সবারে নমি আমি' গ্রন্থে কানন দেবী বলেছেন, "দিদি ছবিতে চন্দ্রাবতীর প্রেসিডেন্টের অভিনয় এখনও চোখের সামনে ভাসে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও ডিগনিফায়েড রোলে ওকে দারুণ মানাত। আর সব মিলিয়ে ওর জোড়া রূপসী এ লাইনে খুব কমই ছিল।" এই কথাতেই বোঝা যায় সে যুগে চন্দ্রাবতীর কি খ্যাতি ছিল চিত্র জগতে।

'ডিগনিটি' তিনি চিরদিন বজায় রেখে চলেন। 'বড়দিদি' ছবিতে 'শান্তি' চরিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শকদের বিশেষভাবে ভাল লেগেছিল। দেশের মাটিতে ডিগনিফায়েড রোল অরুণার। দুর্গাদাস, গায়ক অভিনেতা কে এল সায়গল, লীলা দেশাই এর মতো অভিনেতা অভিনেত্রীদের মাঝে চন্দ্রাবতী অনন্যা।

চন্দ্রাবতী অভিনয়কে প্রাণের সম্পদ করে নিয়েছিলেন। তাই নায়িকা কিংবা অন্য যে কোন চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতেন। তাই তাঁর অভিনীত সব চরিত্রই দর্শককে আকর্ষণ করত। নাহলে নায়িকা হিসাবে যখন তাঁর খুব নাম ডাক হঠাৎই তিনি নায়কের মা সাজলেন 'শুকতারা' ছবিতে। ছবি বিশ্বাসও ঠিক এমনি ভাবে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়

করতে করতে হঠাৎই দেবকীকুমার বসুর 'নর্তকী' ছবিতে ৯০ বছরের বৃদ্ধ স্বামিজীর ভূমিকায় অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দেন। চন্দ্রাবতী 'শুকতারা' ছবিতে নায়কের মা অন্নপূর্ণা চরিত্রে এত ভাল অভিনয় করেন যে সে বছর তিনি বঙ্গীয় চিত্র সাংবাদিক সংস্থার বিচারে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর মর্যাদা পান। পরের বছর ১৯৪১ সালে নিউথিয়েটার্সের 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে দেহ-জীবিনী সুমিত্রা চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে আবার পুরস্কার পান। এ ছবিতেও কিন্তু তিনি নায়িকা নন।

আবার নায়িকা হলেন তিনি প্রবোধকুমার সান্যালের 'প্রিয়বান্ধবী' ছবিতে দুর্গাদাসের বিপরীতে। দুর্গাদাসের এ ছিল শেষ ছবি। ছবি মুক্তি পাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। নায়ক নায়িকা দুজনেই সেবছর বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির বিচারে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। জহর ও শ্রীমতী চরিত্রে দুর্গাদাস ও চন্দ্রাবতীর অভিনয় সকলের প্রশংসা আদায় করেছিল। 'দেশ' পত্রিকা লিখেছিল, "রচনার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা হোতনা যদি প্রধান চরিত্র দুটিতে দুর্গাদাস ও চন্দ্রাবতীর মত শিল্পী পাওয়া না যেত। এদের দুজনেরই বয়স এমন ছাপিয়ে গেছে যে জহর ও শ্রীমতীর মত চরিত্রে বে-মানান হবে বলে আশংকা হয়েছিল। কিন্তু দু-জনেই রূপ সজ্জায় এবং অভিনয়ে এমনি অদ্ভুতভাবে মানিয়ে নিয়েছিল যে এঁরা দুজন ছাড়া ঐ চরিত্র দুটিকে এমন সজীবিত করে তোলা আর কারুর পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না।"

'দুই পুরুষে' ও চন্দ্রাবতী নায়িকা। এই ছবির চিত্রনাট্যে ত্রুটি থাকলেও অভিনয় গুণে ছবিটি জনপ্রিয় হয়। একজন সমালোচকের মতে, "নুটু বিহারী চরিত্রে ছবি বিশ্বাস, বিমলার চরিত্রে চন্দ্রাবতী এবং কল্যাণীর ভূমিকায় সুনন্দা দেবী অনবদ্য অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁরাই অভিনয় করে দর্শকদের মনকে ছবিখানির দিকে টেনে রাখতে সাহায্য করেছিলেন"। সে বছর বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির বিচারে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে ছবি বিশ্বাস ও চন্দ্রাবতী শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পান।

চল্লিশের দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি 'ভাবী কাল' ছবিতেও চন্দ্রাবতী অনন্যা। এ ছবি সে বছর প্রথম হয়। 'ভাবীকাল' ছবির সাফল্যের পিছনে সম্মিলিত সুন্দর অভিনয় বড় ভূমিকা নিয়েছে। সমালোচকরা একবাক্যে চন্দ্রাবতীর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন।

'পথের দাবী'তে সুমিত্রার মত ডিগনিফায়েড রোলে চন্দ্রাবতীকে ছাড়া মানায় না। চন্দ্রাবতী 'সুমিত্রা'কে একেবারে বাস্তবসম্মত করে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কথা বলার ধরণের মধ্যেই কেমন যেন একটা কর্তৃত্বের ভাব। এছবির জন্যও তিনি পুরস্কৃত।

পঞ্চাশের ও ষাটের দশকেও চন্দ্রাবতী বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। টাইপ চরিত্রে। সেখানেও তিনি অনন্যা। কানন দেবী, উমাশশী, যমুনা বড়ুয়া, চন্দ্রাবতী সব একই যুগের একই কালের অভিনেত্রী। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বমহিমায় বিরাজ করেছিলেন। অতীতের সেই সব ছবি এখনও যখন কোন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয় তখন তা দেখতে দেখতে একটা নষ্টালজিক ভাবের উদয় হয়। মন কেমন উদাস হয়ে যায়। আর ভাবি আজকের দিনে তাঁদের মতো অভিনেত্রী কেন হয় না। আন্তরিকতা, নিষ্ঠা তাঁদের মধ্যে ছিল, কত অসুবিধা অব্যবস্থার মধ্যেই না তারা কাজ করে গেছেন। আজ এই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাবটা বড় পীড়া দেয়। আর তখনই এঁদের জন্য মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

---

১৯ পাতার শেষাংশ

দেখা গেল সবাই কম বেশি জানে যে উনি একজন ইন্ডিয়ান ফিল্ম ডিরেক্টর। তবে পৃথিবী বিখ্যাত পরিচালকদেরও সমতূল্য এবং পৃথিবীর বিখ্যাত দশজন পরিচালকদের মধ্যে একজন পুরোধা তা তারা জানেনা। তবে আমি বিস্মিত হলাম যে, ডোনা কি আগ্রহ নিয়ে সত্যজিৎ এর ওপর লেখা The Inner Eye এবং Spech on Satyajit Ray বই দুটি পড়েছে, আর সেদিনের আড্ডার পরবর্তী দিন ঠিক করা হলো। এবং সেদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে প্রজেক্ট অফ সত্যজিৎ রায়।

সভাশেষে যথারীতি সাবওয়ের দিকে যেতে যেতে ডোনা জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের ওখানে এখানকার মতো Sound Effect কিনতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয় না। আমি বললাম। তাহলে সত্যজিতের ছবিতে এত ভালো Sound শুধুই কি ওনার নিজের Collection মানে Tape কাধে নিয়ে এখানে ওখানে Sound Collect করা থেকে, না যখন উনি এখানে আসতেন তখন এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতেন?

Wait a minite তুমি কি করে জানলে উনি Tape নিয়ে—

তোমার বোধহয় মনে নেই বেশ কিছুদিন আগে আমাদের Joint Project এ লুদভরিন এবং film theory & Analysis খুঁজেছিলাম। সেই সুত্রে Lenctan centre public library তে ঐ বইটা খোঁজার সময় রে'র উপর বেশ কিছু বই দেখিয়েছিলে। মোট সতেরটা বই আছে-ওখানে। ঐ বইগুলো কিছুদিন ধরে নাড়াচাড়া করেছি। ডোনা বলল-তোমার কি মনে হয় প্রশ্নের মাধ্যমে অজানা কথা বা ব্যক্তিত্ব বার করা যায়। আমি চললাম-মিঃ টেড কাপেল বা মিঃ ব্যঙ্কার ওয়ালেটাস্ কে দেখেছি বার করতে। যদি ওনারা কোনদিন সত্যজিতকে প্রশ্ন করতেন তাহলে হয়তো অজানা সত্যজিৎ বেড়িয়ে আসতো। ডোনাকে বললাম-যাবে নাকি কলকাতায়? দেখা করতে নয়, সত্যজিৎকে প্রশ্ন করতে? যে সত্যজিৎকে তুমি জানতে চাইছো এখনো অবধি কেউ জানে না। ডোনা বলল, আমি তোমার সঙ্গে কলকাতা যেতে পারি। কিন্তু তার আগে রিসার্চ ওয়ার্ক করে যেতে হবে। আমার একটা প্রশ্ন ওনাকে করবার ইচ্ছে আছে—যদি পথের পাঁচালীর আগে আপনি ঘরে বাইরে করতেন, তাহলে কি ছবিটা পথের পাঁচলীর মতই সাকসেস্‌ফুল হত? তাহলে আপনার প্রক্রিয়া কি হত?

ডোনার কলকাতায় আসা কিম্বা রিসার্চ ওয়ার্ক কোনটাই হয়ে ওঠেনি, ঘরে-বাইরে পত্রিকার অনুরোধে আমার ব্যক্তিগত জানা বা অভিজ্ঞতা কিছু তুলে ধরলাম। আজ আমার প্রেরণা সত্যজিৎ প্রয়াত। লিখতে বসে বন্ধু ডোনার কথা বারবার মনে পড়ছে। নিউ-ইয়র্কে যদি সত্যজিতের কোন ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া না যেত তাহলে ডোনা তা সংগ্রহ করত প্যারিসে গিয়ে ডোনার রিসার্চ থেকে দশটা প্রশ্ন যদি সত্যজিৎকে করা যেত, যদি সেই প্রশ্নের মাধ্যমে এক অজানা সত্যজিৎকে পাওয়া যেত! 'যদি' আজ সবটাই যদি হয়ে রয়ে গেল। এটাই আমার এবং ডোনার দুর্ভাগ্য।

ঘটনাময় স্মৃতি

স্বপন মল্লিক

তখন আমি সবেমাত্র ফিল্ম নিয়ে লেখার একটা দারুণ অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে উত্তেজনায় আছি। সেটা ১৯৭৪ সালের জুন মাস। সত্যজিৎ রায় তখন বার্লিন থেকে 'অশনি সংকেত'-এর জন্য স্বর্ণ ভল্লুক নিয়ে কলকাতায় ফিরছেন। 'মহানগর'-এর সময় থেকেই সত্যজিৎ বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সমর্থন পাচ্ছেন, কিন্তু তা রৌপ্যভল্লুকেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এবারই পেলেন গোল্ডেন বীয়ার, একটা ছোট্ট সুন্দর ট্যাচু। তবে তার মতো বিরাট মাপের মানুষের কাছে, যাকে কিনা তখনি বার্গম্যান, অ্যান্তোনিওনি, কুরোসাওয়া-র মতো ধ্রুপদী চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গে এক সারিতে বসানো হচ্ছে, এই সম্মান তেমন কোনো একটা ব্যাপার নয়।

ফোনে যখন আসার কথা বললাম, বললেন 'কী আর বলার আছে'। জোর করায় কথা বলতে রাজি হলেন কয়েক মিনিট। কিন্তু সেই কয়েক মিনিট আধঘণ্টা হয়ে গেল এবং তার মধ্যে ফোন বেজে গেলেও একবারও ধরতে উঠলেন না। সব কিছুর প্রতিই সবসময় তার মনোযোগ থাকত। কথার মধ্যেও ডিভানে পা তুলে ইজেলে ছবি এঁকে যেতেন। তখন হয়ত ঘরের মধ্যে লোকজন ঘোরাফেরা করছে তাঁর ওপর ডকুমেন্টারী তোলার কাজে বা তাঁর ওপর কোনো লেখার ছবি তুলতে।

যখন তিনি পূর্ণ উদ্যমে ফিল্ম করে যাচ্ছেন, গল্প লিখছেন, ইলাস্ট্রেশান করছেন, সঙ্গীত রচনা করছেন, তখনও সকাল আটটা থেকে ঐ চেয়ারে বসে নিজে ফোন ধরতেন, দরজা খুলতেন এবং এত স্বচ্ছন্দে সবার সঙ্গে কথা বলতেন যে বোঝাই যেত না কী পরিমাণ কাজে ব্যস্ত আছেন। কফি হাউসের সেই দিনগুলো থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা ছিল তার সময় কাটানোর প্রিয় বিষয়। তাই যখন শ্যাম বেনেগাল তাঁর ওপর কাহিনী চিত্র-দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র তুলতে এলেন তখন চরিত্রের এই দিকটাকেও উনি ধরে রাখলেন। বেনেগাল চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ কফি হাউসের দিনটাও ছবিতে ধরে রাখতে। এবং তা তুলতে স্টেটসম্যান হাউসের ছাদ ছাড়া আর ভাল কী স্পট হতে পারে। গোবিন্দ নিহালনি তখন ওঁর ক্যামেরাম্যান। আমি ওঁদের দুজনেক ওপরে নিয়ে গেলাম। নিহালনি এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে লাফিয়ে কার্ণিশে উঠে পড়লেন। আর আমি ওঁকে ধরে রইলাম যতক্ষণ উনি ক্যামেরায় ধরতে লাগলেন নবীন ও প্রবীন বুদ্ধিজীবিদের আসন্ন কলকাতা ফিল্মোৎসবের ওপর আলোচনার দৃশ্যগুলো।

তখন ১৯৮২। সত্যজিৎ সবে শেষ করেছেন 'হীরক রাজার দেশে'। এবং ভাবছিলেন 'ঘরে বাইরে' ফিল্মে করার কথা (এটা ওঁর করার ইচ্ছা 'পথের পাঁচালী'-র আগে থেকেই)। আমি আগেই ওঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম ওঁর তৈরি রবীন্দ্রনাথের গল্প ভিত্তিক ফিল্মগুলো নিয়ে এবং তখন থেকেই জানতাম বিমলা চরিত্রের জন্য উপযুক্ত অভিনেত্রী না পাওয়ায় 'ঘরে বাইরে' না শুরু করতে পারার দুঃখ। কিন্তু তবুও তিনি বলতে চাননি কাকে দিয়ে ঐ চরিত্রটা করানোর ইচ্ছা।

সর্বদাই এ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু বেনেগালের ফিল্মের ব্যাপারে উনি নিজেও জড়িয়ে যাওয়ায় সময় করতে পারছিলেন না। সেই সময় স্টেটসম্যান ফিল্মোৎসব নিয়ে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করে এবং সবাই সাগ্রহে চান ওতে সত্যজিৎ-এর লেখা থাকুক। আমি খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ওঁর কাছে কথাটা পাড়লাম এবং অপেক্ষা করতে থাকলাম ওঁর সিদ্ধান্তের জন্য। 'আগে প্রশ্নগুলো দেখি, তারপর দেখা যাক কী করা যায়'। এই একটি কথাতেই বুঝে গেলাম যে যতই ব্যস্ততা থাক উনি লিখবেন, খুব বেশি হলে হয়ত উত্তরগুলো বলে যাবেন, লিখে নিতে হবে। যখন দুদিন বাদে যোগাযোগ করলাম। তখন বললেন উনি নিজেই লিখবেন এবং তার নামটা হবে 'আওয়ার ফেস্টিভ্যালস্, দেয়ার ফেস্টিভ্যালস্', যা প্রত্যেক চলচ্চিত্র অনুরাগীর কাছে এখন অবশ্যপাঠ্য।

কয়েকদিন বাদে ফিল্মোৎসবের সময়ে আরো অবাক হয়ে গেলাম। বিদেশী আমন্ত্রিতেরা জানতেন যে কলকাতা সত্যজিৎ-এর শহর। তখন সবেমাত্র দরদর্শন-এর জন্য 'সদ্‌গতি' তৈরি হয়েছে এবং ফিল্মোৎসবে দেখানো হচ্ছে 'পিকু'-র সঙ্গে, যা কিনা তৈরি ফরাসী টেলিভিশনের জন্য। বিদেশী আমন্ত্রিতদের তুলনায়, এখানকার উৎসাহীরাই নিউ এম্পায়ার-এ ভিড় করলেন এবং কাঁচের দর্জা ভেঙে ভেতরে ঢুকলেনও। উৎসবের উদ্বোধনের সময় সত্যজিৎ যে কত খাঁটি কথা বলেছিলেন তা প্রমাণ করলেন। সত্যজিৎ বলেছিলেন—এখানকার রাস্তাঘাটের নোংরা, ভিড়, পথ অবরোধ, মিছিল বাদ দিলে কলকাতা এক দারুণ জায়গা, বিশেষ করে ফিল্মের ক্ষেত্রে।

যখনই তিনি দেখেছেন কেউ ফিল্ম সম্পর্কে উৎসাহী, তখনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন এসপ্ল্যানেডে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর রিডিং রুমে গিয়ে নিজে হাতে খুঁজেছেন চল্লিশের স্টেটসম্যান পত্রিকার ফাইল। কেননা ওতে বেরিয়েছিল ওঁর অনেকগুলি ছবি যা তিনি এঁকেছিলেন একটা বিজ্ঞাপনের জন্য। এবং এটা তিনি করেছিলেন বেনেগালের ঐ তথ্যচিত্রটির জন্য। আবার ঠিক বইমেলার আগে, যখন আর একটা বইয়ের পরিকল্পনা চলছে, তখন একদিন সন্ধ্যেবেলা আমাকে ডাকলেন 'ঘরে বাইরে'-এর শুটিং থেকে ফিরে। উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণদেবের উপর অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের লেখা বিখ্যাত বইটির প্রচ্ছদ বাছা। কেবলমাত্র কয়েকটা ছবি পাওয়ায় দুঃখ পেলেন। বলেছিলেন নিজের সব আঁকাগুলো ঠিকমতো নিজের দোষেই গুছিয়ে রাখতে পারেন নি।

যখন 'ঘরে বাইরে' কানস্-এ বিশেষ প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রিত হলো, তখন সত্যজিৎ পুরস্কার পেয়ে পেয়ে বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু বিশ্ববাসী তাঁর কাজের প্রতি উৎসাহ হারায়নি, সে অংশত ছেলে সন্দীপের হাতে শেষ হলেও। ওঁর প্রথম হার্ট অ্যার্টাক হলো ১৯৮৪-তে, ফরাসী চলচিত্রোৎসবে ছবিটি পাঠানোর কয়েকমাস আগে। ওরা চেয়েছিল আমি ওঁর একটা বড় সাক্ষাৎকার নিই, জানত না যে তখন সত্যজিৎ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আবারও সেই প্রশ্নোত্তর। এবং আমি ভেবেইছিলাম যে এবার আর হলো না। এবং অবাক কাণ্ড সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন, শুয়ে শুয়েই, তা সে ওঁর ফিল্মের ব্যাপারেই হোক বা পূজা সংখ্যার জন্য উপন্যাসের ব্যাপারেই হোক।

স্বাস্থ্য যখন ভেঙে পড়েছে তখন যদি এরকম কাজ করতে পারেন, তাহলে বুঝতেই পারছেন প্রথম জীবনে কী ধরনের কষ্ট সহ্য করেছেন।

ফিল্মতৈরির সবকিছুই যেমন নিজে নিজে শিখেছিলেন, তেমনি শিখেছিলেন সঙ্গীত রচনাও। সত্যজিৎ-এর নিজস্ব বিশ্বাসের প্রতি আস্থা ছিল, সাহস ছিল। এমার্জেন্সীর সময় করলেন 'জন-অরণ্য'। মনে পড়ছে রাজ্যের তথ্যমন্ত্রীর পাশে বসে প্রিমিয়ার শো দেখার কথা। মন্ত্রীমহাশয় খুবই অস্বস্তিতে পড়েছিলেন যখন ফিল্মে দেখা যাচ্ছে এক বেকার যুবক দেখা করছে পাড়ার এম.এল.এ-র সঙ্গে। সমাজ পরিবর্তনের অনেক উচ্চকণ্ঠ প্রচেষ্টার তুলনায় এই একটি ফিল্মে এস্ট্যাবলিশমেন্ট-এর বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে তা তুলনাহীন। তাই যখন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী, ঘটনাক্রমে তার স্কুলের সহপাঠী, বললেন 'মানিক আমাদের বক্তব্য গুলো বোঝে না' তখন সত্যজিৎ হেসেছিলেন এবং সে হাসি করুণার হাসি।

কিন্তু মাঝেমাঝে সত্যজিৎ নিজেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তেন। যেমন যখন ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট কর্পোরেশন আর ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন মিলে তৈরি হলো ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন। বলা হলো এন.এফ.ডি.সি হবে ফিল্ম নিয়ে সরকারী উদ্যোগে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। সেই সময়ে কমার্শিয়াল ও আর্ট ফিল্মের মধ্যেকার ভেদরেখা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে যেসব চলচ্চিত্রকারেরা ছবি করছিলেন তারা এন.এফ.ডি.সি-র কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেতেন। তাঁদের মনে হলো যে, ঐ নতুন তৈরী হওয়া এন-এফ.ডি.সি-তে যদি মেইনস্ট্রীম সিনেমার কেউ প্রধান হয়ে বসেন তবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দৌড়ে সবাই চলে এলেন কলকাতায় সত্যজিৎ-এর কাছে। উদ্দেশ্য যদি ওঁর কাছে এই পদের জন্য আমন্ত্রণ আসে, এবং যদি উনি রাজী হন, তাহলে সরকার আর কারুর কথাই ভাববেন না।

দিল্লীতে ফাইল নিয়ে কাজ করতে হবে? সত্যজিৎ-এর দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সৈয়দ মীর্জা, গৌতম ঘোষ-এর মতো টগবগে তরুণরা 'না' শুনতে আসেননি। খবর পেলাম সত্যজিৎ আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন এবং খুব তাড়াতাড়িই। 'আমি কী করে সরকারী উদ্যোগের চেয়ারম্যান হতে পারি। শেষ হয়ে যাব। ওরা আমার কাজের ধরণটা বোঝে না। বড়জোর পরামর্শদাতা হতে পারি।' স্টেটস্‌ম্যান-এর কলকাতা ও দিল্লী সংস্করণে খবরটা বেরুল। ঐদিন সকলেই তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বসন্ত শাঠে ফোনে সত্যজিৎ-কে জানালেন যে ওঁকে করা হয়েছে অ্যাডভাইসার।

কিন্তু এসব ঘটনাই তুচ্ছ ১৯৬৪ সালের সেই ব্যাপারটার কাছে। তখন মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' নিয়ে সত্যজিৎ ও মৃণালের মধ্যে স্টেটস্‌ম্যান-এর পাতায় পত্রবির্তক চলছে। শুধু ঐ দুজনই নন, যোগ দিলেন আরো অনেকে এই বির্তকে। অনেক বছর পরে এটা বই-এর মধ্যে বেরিয়েছিল, এখনও সুখপাঠ্য। সত্যজিৎ বুঝেছিলেন ফিল্ম মাধ্যম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অভাব। আর তাই যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট পেলেন, সেই সুযোগ বললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ফিল্ম স্টাডিজ রাখার কথা। তাও অনেকদিন আগের কথা। নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে বিশেষ অস্কার পেয়ে যখন তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন আমেরিকার পথ প্রদর্শকদের প্রতি, তখন নিশ্চয়ই কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমে ফিল্ম নিয়ে পড়ানোর কথা শুনে। গুরু চলে গেলেন কিন্তু রেখে গেলেন নিজের সৃষ্টি। বারংবার ওঁর ছবি দেখে আমরা আনন্দ পাব, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে আমাদের মধ্যে।

'পথের পাঁচালি'; সম্বর্ধনা সভায় শিল্পী ও কলাকুশলীসহ। ছবি : পারিবারিক সংগ্রহ

সত্যজিৎ-এর চলচ্চিত্রে আবহ সঙ্গীত

সন্দীপ মিত্র

'সিনেমার বুদ্ধিমান দর্শকের কাছে সঙ্গীতের তেমন প্রয়োজন নেই, শুধু যারা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন তাদের বোঝানোর জন্যই সঙ্গীতের প্রয়োজন।' কথাটি সত্যজিৎ রায়ের। শুনে খটকা লাগে, কেননা অন্য অনেক কিছুর মতোই, সিনেমায় আবহসঙ্গীতের যথাযথ ও পরিণত প্রয়োগে সত্যজিৎ রায়ই অগ্রণী। ওঁর ছবির আবহসঙ্গীত এমনভাবে ছবির সঙ্গে জুড়ে থাকে যে তা চরিত্রদের ইমেজ বা ছবি থেকে আদৌ আলাদা করা যায় না।

চলচ্চিত্রে সঙ্গীত বলতে বোঝায় গান, আবহ, দ্যোতনা শব্দ। কিন্তু গান আর আবহই সবচাইতে গুরুত্ব পায়। বাস্তবে যা ঘটে তা হলো, অফুরন্ত গানের ব্যবহার। কিন্তু আবহসঙ্গীতই হওয়া উচিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তা ছবির সামগ্রিকতার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। যখন কোনো দৃশ্যকল্পে সংলাপ দিয়ে দৃশ্যটাকে পরিস্ফুট করা যাচ্ছে না তখনই প্রয়োজন এই আবহের। একটা গান সুপ্রযুক্ত না হলেও উৎরে যেতে পারে। কিন্তু আবহের ব্যাপারটা চট করে সবার মাথায় অত সুন্দরভাবে খেলে না এবং এর জন্য দরকার এক ধরনের চেতনা ও শিল্পবোধের যেটাকে সঙ্গীত পরিচালকের ওপর পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে চিত্র পরিচালক নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। এবং এই কারণেই বোধহয় সত্যজিৎ শুরু করলেন সঙ্গীত পরিচালনাও, অবশ্যই নিজের ছবিতে।

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছয়টি ছবিতে আবহসঙ্গীত রচনার ভার ছিল নামকরা ওস্তাদদের ওপর, কেননা তখন হয়তো সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে তাঁর নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থা ছিল না। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'পরশপাথর', 'অপুর সংসার'-এ আবহসঙ্গীত রচনা করলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, 'জলসাঘর'-এর ধ্রুপদী ও আবহসঙ্গীত বিলায়েৎ হোসেনের এবং 'দেবীর' আবহসঙ্গীত রচনা করেন আলি আকবর খান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষে 'তিনকন্যা' করতে গিয়ে তিনি ধ্রুপদী ওস্তাদদের ফিল্মসঙ্গীত রচনা সম্পর্কে কিছুটা হতাশ হয়ে গিয়ে সেই যে সঙ্গীত রচনা শুরু করলেন, তা আমৃত্যু করে গেছেন, ফিরে তাকাননি ওস্তাদদের দিকে আর একবারও। তিনি নিজেই বলেছিলেন, কাহিনীচিত্র করতে গিয়ে তাঁর সবচেয়ে বেশি সময় ও মনন লাগে আবহসঙ্গীত রচনায়।

জনপ্রিয় ছবি আর মননশীল ছবি এই ভাগটা যখন থেকে শুরু হয়ে গেল, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তখন থেকেই ভাগ শুরু হলো। প্রাক্-'পথের পাঁচালী' পর্বে আমাদের ধারণা ছিল যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাবে নানারকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করলে, অর্কেস্ট্রা না লাগালে সঙ্গীতের বডি তৈরি হয় না, হলিউডীয় যে জমাটি ব্যাপারটা থাকে সেটা আসে না এবং তা না হলে পরিস্থিতির তাৎপর্য প্রকাশ পায় না। 'পথের পাঁচালী'র পর থেকেই সেই ধারণা পাল্টাতে শুরু করল। এল 'পথের পাঁচালী'র বাঁশি। একটামাত্র যন্ত্র দিয়ে যে একটা ভাব প্রকাশ করা যায় সেটা তিনিই আমাদের দেখালেন। আমরা লক্ষ্য করলাম, একটি যন্ত্রের সাহায্যে একটা চরিত্রের বিভিন্ন ভাবকেও সঙ্গীত দিয়ে গ্রথিত করা যায়—এই চিন্তাটাও আগে ছিল না। 'পথের পাঁচালী'র প্রধান সুরটা—'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল পার কর আমাকে'—যেটা ইন্দির ঠাকরুণের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো তা একদিক দিয়ে যেমন ওর চরিত্রকে তেমনি অন্যদিকে গোটা ছবির মূল ভাবকে গ্রথিত করল। কাজেই 'পথের পাঁচালী'র সুর দিয়ে একদিক থেকে হলিউডের প্রকট শব্দময় সঙ্গীত থেকে যেমন সরে এলেন, তেমনি ওর মাধ্যমে একটা চরিত্র বা ঘটনাধারাকে প্রকাশ করলেন।

আরও একটা জিনিস 'পথের পাঁচালী'তে ঘটল। মানুষের বুকফাটা কান্নার শব্দ দর্শকদের একটুও শুনতে দেওয়া হয়নি। সেই ফাঁকটা পূরণ করেছিল আবহসঙ্গীত। সর্বজয়ার কান্না-দুর্গার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর ঐদৃশ্যে, ঐ মুহূর্তে, ঐ চরম ক্লাইম্যাক্সে—ধ্বনি, কান্না, বা সংলাপ-কোনটাই ফুটিয়ে তুলতে পারত না ঐরকম ভেঙেপড়া জীবনের বুকফাটা কান্নাকে—একমাত্র তারসানাই ব্যবহার করেই ঐ নাটকীয় মুহূর্ত তৈরী করতে সার্থকভাবে সফল হয়েছিলেন সত্যজিৎ। কারণ ঐ কান্নাটা শুধু ঐ বিশেষ মুহূর্তের আবেগের অভিব্যক্তি নয়, স্বামীর আজীবন অমনোযোগিতার বিরুদ্ধে তীব্র অভিমানী অভিযোগ। অর্থাৎ এখানে পরিচালকের দাবি এতটাই বেশি ছিল যে তা শুধু কান্নার অভিনয় দিয়ে পূরণ করা যেত না। তাই সঙ্গীত এই দায়িত্ব নিয়েছিল। কারণ, সঙ্গীত উঁচু স্কেলে যে তীব্রতায় পৌঁছতে পারে—মানুষের কণ্ঠের পক্ষে সেখানে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব।

সত্যজিৎ শুধু সঙ্গীতকে দায়িত্ব দিয়েই থেমে থাকলেন না, মানুষের কণ্ঠকে একেবারে ছুটি দিয়ে দিলেন। দৃশ্যটা করে দিলেন সম্পূর্ণ শব্দহীন। অর্থাৎ সঙ্গীতের জন্য বিশেষভাবে তৈরী হলো বিশুদ্ধ ফাঁক। তারসানাই-এ তীব্রভাবে তারসপ্তকে বেজে উঠল কান্নার সুর (পটদীপ রাগে)। যন্ত্রের তারে যে গমক সৃষ্ট হয়েছিল—তাতে ছিল চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির ধাক্কা। আর তারে যে মীড় টানা হয়েছিল—তাতে ছিল দুঃখের করুণতা। এই সঙ্গীতের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠের বাস্তব কান্না মিশলে—এই মীড় আর গমক তার মধ্যে ডুবে যেত, এবং তাহলেই সঙ্গীতের অভিব্যক্তি তার স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলে, দর্শকদের মধ্যে প্রার্থিত ট্র্যাজিক চেতনা তৈরি করতে ব্যর্থ হতো।

'পথের পাঁচালী'তে সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামীন জীবনধারার নির্যাসকে কাজে লাগিয়ে। একটা সুর এমনভাবে ছবিতে নিবদ্ধ ছিল যে কখনওই মনে হয়নি যে গ্রাম বাংলার বাইরে বসে আমরা ছবি দেখছি। 'পথের পাঁচালী'র থীম মিউজিক 'পা-ধা-পা-সা-নি-পা-ধা-মা-ধা-পা'ই

সত্যজিৎবাবু ব্যবহার করেছেন 'অপরাজিত'তে যখন কাশী থেকে সর্বজায়া পুত্র অপুকে নিয়ে আসছেন। ট্রেন বাংলার সজল প্রকৃতিতে ঢোকা মাত্রই বাঁশের বাঁশিতে হ্রস্ব ধুনটি শুনেই বলে দেওয়া যায় উত্তরভারতের রুক্ষতা থেকে অপুরা এলো বাংলার বিষাদময় সংসারে যা তাদের পরবর্তী জীবননাট্যের এক অমোঘ ইঙ্গিত।

'অশনি সংকেত'-এরও পটভূমি যদিও গ্রাম, তবু বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মানুষের সৃষ্টি কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। এর ট্র্যাজেডি ব্যক্তিগত বেদনার চেয়ে অনেক ব্যাপ্ত। ট্র্যাজেডির সেই বিপুল ব্যাপ্তি, সমস্যার সেই গভীরতা অভিব্যক্ত করা কোনো লোকযন্ত্রের টেক্‌নিক্যাল সাধ্যের বাইরে। তাই সত্যজিৎ রায় বেছে নিলেন ধীরলয়ে চেলোর অতল গভীর শব্দ।

প্রেম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য একই টিউন—একান্তই ব্যক্তিগত দাম্পত্য-প্রেমের আনন্দ হিসাবে যে টিউন-টা বাজানো হয়েছিল সেতার আর বাঁশিতে সেটাই 'অশনি সংকেত'-এর শেষে বেজে উঠেছিল বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষে দেশব্যাপী মৃত্যুর সঙ্গীত হিসাবে। তখন যন্ত্র বদলে গেছে। একটি সেতারের বদলে এসেছে বেহালা-চেলোর ঐকতান, আর দ্রুতলয়ের বদলে বিলম্বিত। গ্রামীন দাম্পত্য প্রেমের নিশ্চিত আবেশের মধ্যে কখন যে মৃত্যু নেমে এসেছিল ওদের ওপরে—যেটা ঐ দম্পতি আগে থেকে একটুও টের পায় নি। কারণ আধুনিক যুদ্ধ সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই ছিল না। নিশ্চিন্ততার পশ্চাৎপটে আধুনিক যুদ্ধের অন্ধ-নিষ্ঠুরতা আরো বেশি স্পষ্ট। তাই ওদের নিশ্চিন্ত আনন্দের সুরকেই সত্যজিৎ বাজালেন মৃত্যুর সঙ্গীতরূপে।

ধরা যাক 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির টাইটেল মিউজিক-এর প্রারম্ভিক পর্যায়টা। শুরুতেই একটা পাহাড়ি লোকসঙ্গীতের কয়েকটা লাইন ছিল। একেবারে খালি গলায় গাওয়া। অথচ এই গানটা আপাতভাবে ঐ ছবির গল্পে অপ্রাসঙ্গিক। কেননা যে শ্রেণীর ভারতীয়েরা এই ছবির ভিত্তি, তাতে ছবির শুরুতে খুব সহজেই আসতে পারত পাশ্চাত্ত্য সুর—লোকসঙ্গীত নয়। কিন্তু ঐ গানটা এলো ফাঁক ভরানোর জন্যেই। ছবিটার ভিত্তি ঐ চরিত্রগুলো হলেও, মূল বিষয় ছিল মুক্তি। ভণিতার পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন মূল্যবোধে উপনীত হওয়ার সাংস্কৃতিক ও মানবিক প্রয়োজনীয়তাই ছবির মুখ্য বিষয়। এই মুক্তির চিন্তাই গোপনে লালিত হচ্ছিল ছবির প্রতিটি চরিত্রের মনের গভীরে। কিন্তু মানুষগুলো নিজেরাও যেন সেটা সচেতনভাবে টের পেত না। তাই ঘটনায় বা সংলাপে ঐ মুক্তির ইচ্ছেটাকে প্রকটভাবে প্রকাশ করাও সম্ভব হয় নি। কারণ, চরিত্ররা যে কথা বলবে না-সে কথা তো আর বাস্তবধর্মী ছবির সংলাপে আনা যায় না। কাজেই ছবির বিষয়বস্তু মুক্তি-র সঙ্গে ছবির বাস্তব উপাদান অর্থাৎ ভণিতা, এটিকেট-এর মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি হয়েছিল। ফাঁকটা ভরানোর জন্যেই ঐ লোক সঙ্গীত দিয়ে ছবিটা শুরু হয়েছিল। সংলাপ বলছে এটিকেটের বিষয়ে, আবহসঙ্গীত বলছে মুক্তির কথা।

মনে করা যাক রাজনৈতিক ফ্যানটাসি-'হীরক রাজার দেশ'-এর একটি দৃশ্যের কথা। হীরের খনির জোরে ধনী হীরক রাজ্যে খনি মজুর আর কৃষকদের দুরবস্থার শেষ নেই। শুধু তাদের দুর্বল করে রেখেই রাজা ক্ষান্ত হয়নি। জনসাধারণের বিচারবোধ ভোঁতা করে দেবার উদ্দেশ্যে পাঠশালাও বন্ধ করে দিচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নিজে এসেছে দেশের প্রধান পণ্ডিতের পাঠশালা বন্ধ করে দিতে। এই দৃশ্যে নিজের হাতে গড়ে তোলা ছাত্রদের ওপর শিক্ষকের গভীর বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। এই ভাবটাই গল্পের পরিণতিতে সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা নিয়েছিল। নিজের ছাত্র ও শ্রমিক কৃষকদের ওপর একইসঙ্গে শিক্ষকের বিশ্বাস ছিল বলেই, সবাইকে একসঙ্গে মিলিয়ে তিনি একনায়ককে সিংহাসনচ্যুত করতে পেরেছিলেন। সুতরাং এই গল্পে আগ্রাসনের ভয়াবহতা বা মন্ত্রীর হাস্যকরতার চেয়েও সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসের শক্তিটাই শেষ পর্যন্ত বেশি। তাই সত্যজিৎ ভয়াবহতা ও হাস্যকরতাকে এই দৃশ্যের সঙ্গীতে স্থান দিলেন না। বেহালা-চেলোর ঐকতানে অতল গভীর শব্দে, সঙ্গীত-শিক্ষকের বিশ্বাসকেই ব্যক্ত করলেন।

থীম টিউন সর্বদাই গল্পের সিদ্ধান্তমূলক উপাদানের প্রকাশক। কোনো কোনো গল্পে চরিত্রই হয়ে ওঠে সিদ্ধান্ত। যেমন 'চারুলতা' ছবিতে সব ঘটনাই ঘটেছিল চারুলতা তার স্বামীর সঙ্গ পায়নি বলে। অর্থাৎ তার একাকীত্বই ছিল সিদ্ধান্তের প্রধান উপাদান। সুতরাং ছবির থীম টিউন-এ ছিল চারুর একাকিত্বের অভিব্যক্তি। যখন সে আনন্দিত-তখন সেই টিউন-টাই দ্রুত লয়ে বেজেছে। আবার তার একাকিত্বের সময় বেজেছে মধ্য-বিলম্বিত লয়ে। থীম টিউন-টা কিন্তু সেই একই, শুধু তার লয় পাল্টে পাল্টে গেছে-এই যা।

পাশ্চাত্য মার্গ সঙ্গীতে জ্ঞান ও আবিষ্টতা সত্ত্বেও সত্যজিৎ নিজের ছবির আবহসঙ্গীতে সর্বদা পাশ্চাত্য যন্ত্র বা সাঙ্গীতিক রূপ ব্যবহার করেন নি। বরং ভারতীয় যন্ত্রাদি ও সঙ্গীতের প্রভাবই সর্বাধিক। সেতার, এসরাজ, বাঁশি, তারসানাই, সানাই, তবলা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, জলতরঙ্গ, গুগাবাবা ছবিতেই শুধু দক্ষিণভারতীয় যন্ত্রাদি—এসব দিয়েই তাঁর আবহসঙ্গীত সৃষ্টি। 'ঘরে বাইরে'-র টাইটেল মিউজিকে ও অন্যত্র তিনি অবশ্য অর্গ্যান ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার রূপটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। 'চারুলতা'র কাহিনী-বিন্যাসে তিনি অবশ্য মোৎসার্তের সোনাটার রূপটি ব্যবহার করেছেন।

ঘটনা, সংলাপ বা ছবি যা বলে উঠতে পারে না—শুধু সেটুকুই, বলা হয় আবহসঙ্গীতে। এবং শৈল্পিক প্রয়োজনীয়তা মেনে তার যথার্থ প্রয়োগ হলেই হয়ে উঠে সাফল্যমণ্ডিত। এই সাঙ্গীতিক বোধ ও চেতনা চিত্র পরিচালকের মধ্যে থাকলে তবেই সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র একাত্ম হয়ে উঠে। আর তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, সত্যজিৎ-এর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তাঁর 'চারুলতা' ও 'ঘরে বাইরে'-তে আবহসঙ্গীত রচনার যে মুন্সীয়ানা লক্ষ্য করা গেছে, সম্ভবতঃ তা এখনো ভারতীয় সিনেমায় তুলনারহিত। আবহসঙ্গীতের যথার্থতা এ দুটি ছবির পরতে পরতে। 'চারুলতা'য় যা কোথাও কোথাও হয়ত বা পূর্ণতা পায়নি, 'ঘরে বাইরে'-তে তা পরিপূর্ণ ও পরিণত।

সত্যজিৎ রিয়ালিজমের সঙ্গে রোমান্টিসিজমকে মিশিয়ে দিয়েছেন

সুজয় বিশ্বাস

কোন কোন মানুষ কখনও কখনও তার সারা জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে নিজেই কোন এক সময়ে ইতিহাস হয়ে ওঠেন। সহস্র মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যান না। সে সাহিত্যই হোক, সঙ্গীত হোক, শিল্পকলাই হোক, আর চলচ্চিত্রই হোক এ রকম এক উঁচুদরের মানুষ সত্যজিৎ রায়—যিনি ভারতীয় তথা বিশ্বের চলচ্চিত্রের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ তিহাস। হঠাৎই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল 'পথের পাঁচালী' নিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আঙিনায়। চেনাজানা পথের বাইরে তিনি যে নতুন 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করলেন তাতেই ভারতীয় চলচ্চিত্র রাতারাতি নাবালকত্বের তকমা এঁটে বেরিয়ে এল। চলচ্চিত্র যে শুধুই নাটক বা যাত্রা নয়, হাসি আর বিনোদন মাত্র নয়, চলচ্চিত্রও যে একটা শিল্প ও সাহিত্য হতে পারে 'পথের পাঁচালী'র আগে আমাদের সে সম্পর্কে কোন ব্যাপক ধারণা গড়ে ওঠেনি। এর আগে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দেখা গেছে দু একটা ছবির দুএকটা দৃশ্য হয়ত কখনও কখনও শিল্পময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু কখনও তা এত ব্যাপকতা পায় নি। সত্যজিৎই প্রথম তাঁর চলচ্চিত্রের পথ পরিক্রমার সূচনাতেই বুঝিয়ে দিলেন চলচ্চিত্র শুধু বিনোদন যাত্রা নয় তা শিল্প ও সাহিত্যও বটে। প্রখ্যাত পরিচালক মৃণাল সেন যথার্থই বলেছেন, 'পথের পাঁচালী'র সেই জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে এ যেন এক বিরামহীন পরিক্রমা, এক আশ্চর্য ইতিহাস, শুরু আছে, শেষ নেই। শুধু অপুরই নয়, শুধু গ্রাম বাংলার নয়, এ যাত্রা গোটা বাংলার, গোটা ভারতের, গোটা বিশ্বের।'

চলচ্চিত্রের পথ পরিক্রমায় ইতিহাস রচনাকারী সত্যজিৎ এসেছিলেন আলোকবর্তিকা নিয়ে। সে আলোয় পথের অন্ধকারই দূর হয়নি, সে আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছেন কেউ কেউ, কিন্তু সেই মূল আলোটি নিভে গেলে চারদিকে নিঃসীম অন্ধকার যার অপর নাম শূন্যতা। সত্যজিতের মৃত্যুতে ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নিদারুন শূন্যতা দেখা দিয়েছে।

সত্যজিতের যাত্রা শুরু 'পথের পাঁচালী'তে। আর তার শেষ অনেক বাঁক পেরিয়ে চড়াই উৎরাই কাটিয়ে 'আগন্তুকে'। কিন্তু তাঁর প্রায় এই চারদশকের পথ পরিক্রমায় তপন সিংহ, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তরুণ মজুমদার থেকে আরম্ভ করে একেবারে হাল আমলের উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, নবেন্দু চ্যাটার্জি, শ্যাম বেনেগল, গিরিশ কারনাড, গোবিন্দ নিহালনি প্রমুখের মধ্য দিয়ে যে সড়কটি তিনি মজবুত করে দিয়ে গেলেন সে পথে নিরুপদ্রবে নিরাপদেই চলবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আগামী যাত্রা। হয়ত নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।কিন্তু প্রথম আলোক বর্তিকাবাহীর সম্মান পাবেন সত্যজিৎ রায়ই।

আজ দেশে বিদেশে সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়ে অনেক প্রশংসার বাণী শোনা গেলেও 'পথের পাঁচালী'র পর তাঁর 'অপরাজিত' ছবি নিয়ে সেদিন বিরুপ সমালোচনার ঝড় ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ, তিনি ভারতের দারিদ্রকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন। তাঁর ছবি অনেক বেশি নীতি শিক্ষামূলক, রসকষহীন ছবি,তাই তাঁর 'পথের পাচালী' 'অপরাজিত' প্রভৃতি ছবি বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠাতে গররাজি ছিলেন তখনকার আমলারা। তখনকার প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহর লাল নেহরুর হস্তক্ষেপে তাঁর ছবি বিদেশে পাঠানো হয় এবং বিজয়মালা নিয়ে আসে।

সত্যজিৎ রায়কে দারুন ভাবে নাড়া দিয়েছিল ডি'সিকার 'বাইসাইকেল থিবস' ছবিটি। লন্ডনের একটি প্রেক্ষাগৃহে ১৯৫০ সালে ছবিটি দেখার পরই তাঁর মধ্যে ছবি তৈরির অদম্য বাসনা জাগে। ঠিক করে ফেললেন ডি'সিকার মতো ছবি করবেন। ডি'সিকার ছবিতে যেমন রোমের শহরতলি তেমনি 'পথের পাঁচালীতে' অপরূপ গ্রাম। এছাড়া জাঁ রেনোয়া যখন দি—রিভার ছবি করতে ভারতে আসেন সত্যজিৎ বাবু খুব কাছ থেকে রেনোয়ার ছবি করা দেখেন। তখনই তাঁর চলচ্চিত্র নামক সর্বাধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা জন্মায়। রেনোয়া বলতেন, তিনি যখনই কোন নতুন ছবি করেন তখনই তিনি শিশুর মতো হয়ে যেতেন। রেনোয়াকে সত্যজিৎ শ্রদ্ধা করতেন। 'পথের পাঁচালী' থেকে 'আগন্তুক' পযন্ত সত্যজিতও রেনোয়ার মতোই শিশু হয়ে যান। যে শিশু নিত্য নতুন আবিস্কারে আহ্লাদিত। 'পথের পাঁচালীতে' শালুক ফুল, কাশবন, জলের ফোঁটার মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তু উপস্থাপনার গুণে কি বিরাট না ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করে। এ ছবির প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলা হলেও এর আবেদন চিরন্তন।

শুধু চলচ্চিত্রই নয় শিল্পের সকল আঙিনায় তার ছিল অবাধ বিচরণ। তিনি সঙ্গীত পরিচালনাও করেছেন নিজের ছবির—যার সূচনা 'তিনকন্যা'তে 'তিনকন্যা' বা 'অভিযানে' যা পরীক্ষা নিরীক্ষা পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গীত মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। কাহিনী ও বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি শব্দ যোজনা করেছেন। কখনও বা তা পারিপার্শ্বিক শব্দ। পাখির কলতান বা কাহিনীসৃষ্ট কোন শব্দ। সময়কে বোঝাতে তিনি যুগোপযোগী গান ব্যবহার করেছেন। যেমন পোষ্টমাষ্টারে বুড়োদের মজলিসি গান চারুলতায় রামমোহনের কিংবা চিড়িয়াখানায় পুরানো দিনের ফিলমের গান। সঙ্গীত বহুল ছবিতেও তিনি গান ও আবহাসঙ্গীতের সমন্বয় সাধন করেছেন। সংলাপ পর্যন্ত তার সঙ্গী হয়েছে।

বাদ্য যন্ত্রের ব্যাপারে শহুরে বিষয় হলে আধুনিক বাদ্যযন্ত্র আর গ্রামীণ বিষয়ে অন্য ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছেন। ড্রামের ব্যবহারও খুব সংযত ভাবে করা হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রকাশভঙ্গি তাঁর তৈরি শিল্পের মতোই সহজ, সরল, সাবলীল। কিন্তু তা অর্থব্যঞ্জক। তাঁর চলচ্চিত্রের ভাবভাষাও ছন্দের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতের কোন সংঘাত হয় নি। বরং একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

গীতিকার হিসাবে তিনি সহজ সরল শব্দের প্রয়োগ করেছেন। নিজের লেখা গান ছাড়া রবীন্দ্র সঙ্গীতের টুকরো অংশ বা সম্পূর্ন গান ব্যবহার করেছেন। এবং তা সব সময় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়েই উপস্থাপিত। তাঁর গান কখনও ক্লান্তিকর মনে হয় নি, প্রর্যাদগুণে তা ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

একদা বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কাজ করতেন বলে সত্যজিৎ ভিস্যুয়াল আইডিয়াকেই রপ্ত করে ফেলেন। পেন্টিং, ইলাসট্রেসন, প্রচ্ছদ তৈরী থেকে শুরু করে শেষে আসেন সাহিত্যের চৌহদ্দিতে। যেখানেও তাঁর শিল্প চেতনা প্রতিটি ঘটনাকে শিল্পের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখল। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য, ও শিশু সাহিত্যের পাঠকও ফ্রেমের মায়াময়তায় বাঁধা পড়ে গেলেন। একজন প্রতিভাবান শিল্পী যখন তাঁর নিজের মাধ্যম ছাড়া অন্য শিল্প মাধ্যমে আকৃষ্ট হন তখন তার কিছু বিশেষত্ব অবশ্যই আমাদের চোখে পড়ে। সত্যজিতের মধ্যেও এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করার মতো। কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন তিনি কিশোর সাহিত্যের ওপর বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন কেন ? আসলে সত্যজিতের প্রথম ছবির সবটা জুড়ে কিশোর অপুর ও দুর্গা। হয়তো সৃষ্টিকর্মের প্রথম থেকেই কিশোর মনস্তত্ব তাঁকে অস্থির করে তোলে। কিংবা জীবনের সজীব অস্তিত্বের প্রতিফলন একজন শিশুর মানবিকতায় যেভাবে ধরা পড়ে অন্য কোথাও সেভাবে ছাপ ফেলতে পারে না। হয়তো তিনি এইভাবেই অসীম রহস্যের স্পর্শ পেতে কালি কলম ধরেছিলেন।

পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের কথা দিয়েই শেষ করি। 'সত্যজিৎ—এর চলচ্চিত্রে মহত্ব কোথায় খুঁজতে গেলে মনে হয়েছে সত্যজিৎ রিয়ালিজমের সাথে রোমান্টি সিজমের এক প্রচ্ছন্ন মেলবন্ধন ঘটিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর দাবিকে বার বার এক নতুন সৌন্দর্যের মাত্রা দিয়েছে। দিয়েছে আস্বাদের ক্ষেত্রে নতুন উপলব্ধি। নান্দনিক মূল্যে সত্যজিতের ছবি কালোত্তীর্ন। তাঁর ভারতীয় জীবনবোধ, মূলবোধে আস্থা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিবিষ্ট রাখে। সব মিলিয়ে এসথেটিক রিয়ালিজমের স্রষ্টা বোধ হয় সত্যজিৎই। তাই তাঁর হাসি কান্না যন্ত্রনা মৃত্যু কোন কিছুই আমাদের পীড়িত করে না। আমরা বারবার উত্তীর্ণ আনন্দলোকে।'

সত্যজিৎ রায় একটি স্বত্তা একটি বোধ

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে' স্বয়ং কবিগুরুর এ আক্ষেপ বোধহয় মানুষের আবহমান কালের। আক্ষেপ আমারো। আমি জন্ম নিতে পারিনি রবিঠাকুরের কালে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জন্ম নিলাম আরেক কালে যখন রবীন্দ্র উত্তরসূরী আর এক মনীষী মধ্য গগনে বিরাজ করছেন—তিনি অন্য কেউ নন। সত্যজিৎ রায়। একটা মানুষ দাঁড়ালে তার ছায়ার পরিধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু একজন মনীষীর ছায়া যোজন যোজন বিস্তৃত সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। আমিও ভাগ্যক্রমে ঠাঁই পেয়েছি সত্যজিৎ রায়—এর স্নেহের ছত্রছায়ায়। তিনি নিজেই একজন স্বয়ংসম্পূর্ন প্রতিষ্ঠান। আমার এ লেখা সত্যজিৎ রায়কে আলোচনার বিষয় করে তোলা যায়। এ শুধু আমার অন্তরের স্নিগ্ধতম শ্রদ্ধার্ঘ, একজন মানুষকে, যিনি আমার আদর্শ। যাঁর মমতার সৃষ্টি আমার দেহজুড়ে। টুকরো কিছু ঘটনা, হয়তো সেসব এলোমেলো ভাবে বলা। কিন্তু তার মধ্য দিয়েই আমার মননে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।

আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি সত্যজিৎ রায়—এর সঙ্গে দুবার আউটডোর স্যুটিং-এ যেতে পেরেছিলাম। প্রথমবার বেনারসে, দ্বিতীয়বার জয়পুরে। রেনারসে তখন চলছিল 'জয় বাবা ফেলুনাথ' এর স্যুটিং। আমার বাবা বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সত্যজিতের অকৃত্রিম বন্ধু এবং চলচ্চিত্রঅভিনেতা । প্রধানতঃ বন্ধু সত্যজিৎ রায় এর চলচ্চিত্রেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। বেনারসে গিয়ে প্রচন্ড ঠান্ডায় আমি জ্বরে পড়ে যাই। যেদিন জ্বর সারল সেদিন ভোরবেলা আবার গেছি স্যুটিং দেখব বলে। তিনি দূর থেকেই আমাকে দেখতে পেয়ে উদাত্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, কি মিষ্টার জ্বর সেরে গেছে? এস, কাছে এস। আমার মনে হল আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে। শুধু একজন চিত্রপরিচালক হিসাবে নয়, সংসারের অভিজ্ঞ অভিভাবকের মতোই তাঁর কর্ত্তব্য পরায়ণতা ঘিরে রাখত পুরো স্যুটিং ইউনিটকে।

যেকোন মানুষের প্রাত তাঁর সূক্ষ্ম মানবিকতা বোধগুলি আমাকে ঐ আমার তরুন বয়সে ভীষনভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বীরবলের লেখা 'মন্ত্রশক্তি' গল্পে পড়েছিলাম ঈশ্বর বলছে জমিদারকে যে মানুষের চোখই হচ্ছে আসল-এই পর্যবেক্ষন ক্ষমতা না থাকলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে না। জয়পুরের কিছু দূরে নায়লা বলে একটা পাহাড়ঘেরা অঞ্চলের মধ্যে সেদিন মহা ধূমধামের সঙ্গে বিশাল জায়গা জুড়ে স্যুটিং এর প্রয়োজনে তাঁবু পড়েছে। হাতি, উট, মানুষের বিরাট সমাবেশ। বিভিন্ন দেশের রাজারা আমন্ত্রিত হয়ে আজ আসছেন———'হীরক রাজার দেশে', যে সে ব্যাপার নয়। পথের দুপাশে দ্বাররক্ষী। হাতে বিরাট দুন্দুভি নিয়ে প্রস্তুত তোরণের মাথায়, তোরণদার। হাতি, ঘোড়া সব সাজছে। পথের দুধারে পতাকা পোতা। রাজা মহারাজারা যখন তাঁবুর ছায়ায় বসে কোষে তলোয়ার, গালে গালপাট্টা লাগাতে ব্যস্ত———সেই দীঘদেহী মানুষটি তখন ক্রমাগতঃ মরুভূমির তপ্ত বালির মধ্যে রোদ্দুরে হেঁটে চলেছেন এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। সুতীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে দেখছেন দুপাশের সমস্ত আয়োজন। একটু ত্রুটি যেন না থাকে। সমস্ত পতাকাগুলো খুঁটিয়ে দেখছেন, কোন পতাকার কোণ ভাঁজ হয়ে গেছে টেনে ঠিক করে দেওয়া, কোনটা বেঁধে গেছে তাকে সোজা করে দেওয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে সারাক্ষন বালি ভেঙ্গে ভেঙ্গে তার অনুসন্ধান চলছে। সারাদিনের স্যুটিং-এর শেষে মধ্যগগনের সূর্যও যখন ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমে হেলে পড়েছে তখন ও সেই তপস্বী মানুষটি অক্লান্ত। এবার ফেরার পালা। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছড়ানো রইল সারাদিনের স্মৃতি আর বালির উপর অগনিত পায়ের ছাপের মধ্যে দীর্ঘ পদাঙ্কন। সমস্ত দিনের শেষে যেখানের গোধূলি বাতাস ফিসফিসিয়ে ধ্বনিত করে গেল, 'যখন গিয়েছ চলে, দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছে মোর গৃহতলে'।

In the year of Indian independence we formed the first film club in Calcutta. Thereby shackling ourselves willingly to the task of disseminating film culture amongst the intelligentsia. In my job was now firmly established not only as a visualiser, but also as an illustratorand a designer of book jackets. In all this time the thought had not once occurred to me of changing my profession. Graphics were my bread and butter,while films were food for the mind, as music was too. My three years in Santiniketan had opened my eyes and ears to our artistic and musical heritage, so that in addition to buying records of symphonies and concertos. I was now regularly going to concerts of Indian classical music.

The situation that faces us now is this:working in Bengal,we are obliged morally and artristically to make films that have their roots in the soil of our province. Secondly, having in mind the nature of our audience and the resources at our disposal, we are further obliged to aim at an overall simplicity of approach. 'Big' stories are out, and so are big stars. The problem of reaching the mass cannot be solved yet, and will run aim with us as long as illiterey on a large scale exists.If the simple but serious approach can develop into a movement instead of being confined to a handful of individual directors, there is the possibility that the taste of the public can be moulded to accept the new and reject the old.

বন্ধু সত্যজিৎ

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

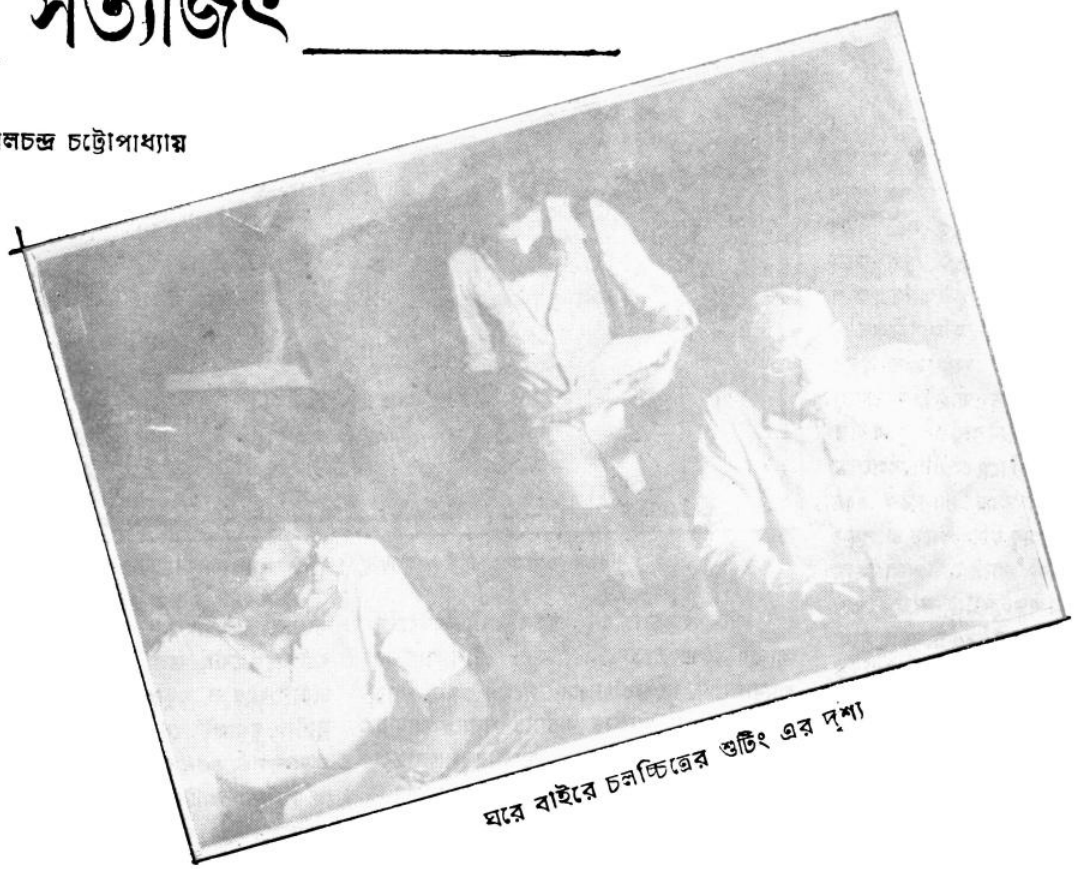

ঘরে বাইরে চলচ্চিত্রের শুটিং এর দৃশ্য

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ চলচ্চিত্রে আমার আসার বহুদিন আগে। তখন আমি ব্যস্ত রাজনীতি ছেড়ে সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক জগতে। সেই সময় আমি বহু বিদগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্যারাসাইকোলজি সোসাইটি স্থাপিত করি। আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর মাধ্যমে সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়। ওয়ান বাই ওয়ান বিশপ লেফ্রয় রোডের বিখ্যাত বাড়িটির আট নম্বর ফ্ল্যাটের বৈঠকখানাটিতে জমজমাট আড্ডা বসে নিয়ত। সত্যজিতবাবু আমাদের প্যারাসাইকোলজিকাল সোসাইটির আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এবং ওই নির্মল আড্ডার আমিও একজন আজীবন সদস্য হয়ে পড়ি। মাঝেমাঝেই তাঁর কাছে যেতাম আর অবাক হতাম শ্রীরায়কে দেখে। আশ্চর্য মানুষ। ঘরভর্তি লোক, সবাই গল্প করছেন, অথচ তাঁর হাত চলে যাচ্ছে অবিরাম। হয় ছবি আঁকছেন, নয়তো চিঠি লিখছেন। কয়েকবছর বাদে একদিন তাঁকে বললাম ভাই আপনি তো কত রকমের ছবি করলেন, জাতিস্মর নিয়ে একটা ছবি করুন না তাহলে প্যারাসাইকোলজী কথাটা সবাই জেনে যাবেন এখনও অনেকে তো ওই ব্যাপারটা বোঝেনই না। —উনি জবাব দিলেন—দেখুন এই বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ছবি করলে সবাই গ্রহণ করবেন না। ব্যস আর কোন কথা হয়নি তার সঙ্গে এ বিষয়ে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। সত্যজিৎবাবুর কাছে অনেকদিন যাইনি। হঠাৎ এক সকালে টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোন ধরতেই অন্যদিকে বেজে উঠলো সেই বিখ্যাত কণ্ঠস্বরের ঝলক—কি মশাই আর আসেন না, গল্প করেন না, আড্ডা মারেন না। কি হলো আপনার। বিনীত মার্জনা চেয়ে বললুম —আপনি কাজে ব্যস্ত থাকেন যেরকম, তাতে আপনাকে বিরক্ত করতে লজ্জা লাগে। তিনি বললেন আপনার সঙ্গে দরকার রয়েছে বড়। তাড়াতাড়ি আসুন একবার। পরের দিনই সকালে গেলাম তাঁর কাছে। আমায় দেখেই তিনি বললেন—লিখে ফেলেছি মিঃ চ্যাটার্জী'। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি লিখেছেন ভাই, হেসে জবাব দিলেন—'জাতিস্মর নিয়ে বই লিখে ফেলেছি।' তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন 'সোনার কেল্লা।

এরপরেও আমার কেটে গেছে বহুদিন। টুক্‌টাক্‌ যোগাযোগ ছিল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। বছর দুই পর একরাত্রে আবার সত্যজিৎবাবুর ফোন এলো। ফোন ধরতেই আবার সেই একই অভিযোগ। এবার একটু আদুরে কড়া সুরে—কি মশায় ভুলে গেলেন নাকি। আসা তো ছেড়েই দিয়েছেন। কুণ্ঠিত হলাম খানিকটা। সত্যি এই ভদ্রলোকটি আমায় এত ভালোবাসেন, অথচ আমি ঠিকমতোই যোগাযোগ রাখতে পারি না। নিজের না যাওয়ার অনেক অজুহাত দেখিয়ে মার্জনা চাইলাম। তিনি বললেন—আজ আপনাকে একটা অনুরোধ করতে ফোন করেছি। যদি না বলেন তবে রিসিভার রেখে দেবো ও বন্ধুত্ব শেষ। আমি তো অবাক। কি করতে হবে বলুন। উনি বললেন, আমি সোনার কেল্লা বইটা ছবিতে তুলছি। আমি আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠলাম। সত্যজিৎ বললেন নিজে খুশি হলে চলবে না। আমাকেও একটু খুশি করতে হবে।—তাঁর কিছু উপকারে লাগব এতো পরম আনন্দের ব্যাপার কিন্তু কে জানবে যে, এ উপকারে মাথায় বজ্রপাত হবে। তিনি বললেন—শুনুন এ ছবিতে আপনাকে একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করে দিতে হবে।

অভিনয়! আমি? আমার পূর্বতন কোনও পুরুষএর কেউ যে ছায়াছবিতে অভিনয় করে-

হন তা তো শুনিনি। দৃপ্তকণ্ঠে সত্যজিৎ জানালেন—আমি তো অভিনয় চাইছি না, আপনাকে চাইছি বন্ধু হিসেবে। এ ডাক জীবনে কেউ দেয়নি আমায়।

স্যুটিং-এর দিন বসলাম দৃশ্যে। আলো ক্যামেরা সব ঠিক হলে সত্যজিৎবাবু কাছে এলেন। এখন তার রূপ ভিন্ন। তাঁর চোখ দুটো যেন ক্যামেরা। বললাম, কি করে বলব একটু বলে দিন। গম্ভীর কণ্ঠে, 'চুপ করে বসে থাকুন' বলে চলে গেলেন। আমি হতাশ হয়ে বসে রইলাম, হঠাৎ তিনি হাঁক দিলেন—মনিটর। তখন শোচনীয় অবস্থা আমার। করুণ স্বরে পাশে বসা সৌমিত্র ভাইকে জিজ্ঞাসা করি—রিহারসাল হবে না বুঝি। তবে কি করে বলব? সহৃদয় ভরসা দিয়ে সৌমিত্র বললেন—বলুন না নিজের মতো করে সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার সত্যজিৎবাবু হঠাৎ কাছে এলেন। আমার গায়ে একটা দামী জামোয়ার শাল ছিল, তো শালের কাজটির একটুখানি ভাঁজ খেয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। উনি ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে ওইটাও দেখতে পেয়ে এলেন শালটা ঠিক করে দিতে। তখন আমি মরিয়া হয়ে কাতর অনুরোধ করলাম, একটু বলে দিন ভাই, কি ভাবে বলব। সত্যজিৎ রায় আমার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বলে উঠলেন 'আমার বাড়ি যান না আপনি? আড্ডা মারেন না?' ঘাড় নেড়ে বললাম—সে তো মারি। 'ঠিক সেইভাবে বলবেন।' বলেই দ্রুত চলে গেলেন সত্যজিৎ। এই হচ্ছে সত্যজিৎ রায়। ওই একটি বাক্যে আমায় তিনি অভিনেতা করে দিলেন।

সোনার কেল্লা রিলিজের কয়েকদিন পর, ঘণ্টা দুয়েক তুমুল আড্ডা মেরে বেড়িয়ে আসছি বিশপ লেফ্রয় রোড থেকে। সঙ্গে আর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু সুভো ঠাকুর। সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আচমকা কানে কানে সত্যজিৎ রায় বললেন—বিমলবাবু, শংকরের 'জন অরণ্য' উপন্যাস নিয়ে ছবি করছি। এবার পার্টটা একটু বড়।

আবার—প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম। 'ধরা পড়ে যাবো যে। কেন ভাই নিজের সুনাম নষ্ট করবেন।' সেটা আমি বুঝবো। শনিবার স্ক্রিপ্ট নিয়ে যাবেন।' গম্ভীর গলার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো। সেই যে আমার নতুন পথে চলা শুরু হলো, তারপর ক্রমে জয়বাবা ফেলুনাথ, হীরক রাজার দেশে এবং ঘরে বাইরে-তেও অভিনয় করলাম। প্রতিটা ছবিতে বিভিন্ন ভাবে তিনি আমায় দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন। জীবনের শেষ অধ্যায় পেলাম শ্রীরায়ের জাদুমন্ত্রে বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিতদের আন্তরিক প্রশংসা আর অভিনন্দন।

'জন অরণ্যে' উৎপল দত্ত, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও আমি

আমি সমস্ত যৌবন ধরে রাজনীতি করেছি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বার বার সারা ভারত ও বাংলার আনাচে কানাচে আমায় ভ্রমণ করতে হয়েছে। বাংলার সাংস্কৃতিক জগতেও আমার নিত্য বিচরণ ছিল আজীবন। চলচ্চিত্র জগতের সমস্ত, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাহার্য্য পেয়েছি জীবনভরে। কিন্তু কোনদিন রূপালী পর্দায় এভাবে আসব সে কথা কখনো ভাবিনি। কৈশোরে ও যৌবনে নাটকের তালিম নিয়েছি শিশির ভাদুরি, নরেশ মিত্র, ইন্দু মুখার্জীর মতো অভিনেতার কাছ থেকে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে রুডুলফ ভলেনটিনো থেকে উত্তমকুমার পর্যন্ত জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয় বার বার দেখেছি।

জীবনের সেই সব অভিজ্ঞতা মনে গেঁথে আছে বলেই বোধহয় সার্থক হয়েছি। আর আমার সার্থকতার মূলে রয়েছে আমার পরম হিতৈষী সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া বীজমন্ত্র—আড্ডা। আমি ছায়াছবিতে আড্ডা মেরেছি। আমার জীবনের শেষ অধ্যায়ে চলচ্চিত্র আমার কাছে পান্থশালা। আর সে পান্থশালায় আমি প্রবেশ করেছিলাম শ্রীরায়ের হাত ধরেই।

আজ সত্যজিৎ নেই। বয়সের ভারে অসুস্থতায়, আমারও স্মৃতি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছে। কিন্তু যখনই এই মানুষটার কথা ভাবি বড় অবাক হয়ে যাই। আমি সমালোচক নই। আমি মানুষ সত্যজিৎকে দেখেছি। মানুষ সত্যজিৎ বন্ধু সত্যজিৎ আমার কাছে অনেক বড়। বার বার তার নানা রূপে মুগ্ধ হয়েছি আমি। খুব ছোট দুটো ঘটনার কথা বলি। সোনার কেল্লা চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্যের শ্যুটিং হচ্ছে ইনডোর স্টুডিওতে। দৃশ্যটি খুব সম্ভবতঃ এই রকম ছিল যে একটি পুরনো ল্যাম্পপোস্টের তলা দিয়ে ফেলুদারূপী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মুকুলের বাবার ভূমিকাভিনেতা সুনীল মুখার্জী হেঁটে আসছে একটা চিঠি পড়তে পড়তে। সেই ল্যাম্পপোস্টের গায়ে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি আটকানো হয়েছে। সব রেডি। হঠাৎ সত্যজিৎ সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। কি ব্যাপার? ধুলো ঝেড়ে খানিক বাদে উঠে দাঁড়িয়ে মানিকদাকে শট টেক করলেন। বিরতির সময় আমি প্রশ্ন করলাম ওভাবে হঠাৎ শুয়ে পড়লেন। সত্যজিতের উত্তর শুনে বুঝেছিলাম কেন সে শ্রেষ্ঠ। তিনি বললেন দেখুন, পর্দায় ঘুড়িটা যাতে হলের দর্শকেরা সমস্ত অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পারেনতা দেখছিলুম। কারণ পর্দা থেকে আমাদের চোখের অ্যাঙ্গেল থাকে নিচের দিকে।

জৈষ্ঠ মাসের একটি দিন। মধ্য কলকাতায় আমার বাড়ির পিছন দিকের একটা বস্তিতে সেদিন জন-অরণ্যর শুটিং হবে। দীর্ঘদেহী মানুষটি অক্লান্ত পরিশ্রমে একটার পর একটা দৃশ্য ধরে রাখছেন তার ক্যামেরায়। সমস্ত শুটিং জোন নিশ্চুপ। আস্তে আস্তে শুটিং শেষ হলো। শুটিং শেষে স্থির আছে এই ইউনিটটি যাবে আমার বাড়িতে বিশ্রামের জন্য। এবার ফেরার পালা। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন প্রাজ্ঞ মানুষটি। হঠাৎ চোখ পড়ল একটা দুর্গন্ধময় ছোট নালার ওপর। বাস ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। নির্দেশ হলো ক্যামেরা নামাতে। সবাই হতবাক। কিন্তু তিনি পুলকিত। দূরে ট্রেনের শব্দ ভেসে এলো। ক্যামেরা তৈরি। ওই নালার ওপর চলন্ত ট্রেনের পড়ন্ত ছায়াটিকে ধরে রাখা হলো। একজন চিত্র পরিচালকের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো চোখ।

আর সত্যজিৎ রায়ের এই অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাই তাঁকে এনে দিয়েছে বরমাল্য।

ওই গম্ভীর মানুষটির আড়ালে লুকিয়ে ছিল সারল্যের মূর্ততা। আমার সংগ্রহে বেশ কিছু দুর্লভ পুরনো বইয়ের সংগ্রহ আছে। 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী' করার সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে যিনি আমার বইগুলো দেখেছিলেন, সেটেও সাজিয়েছিলেন। তো আমার কাছে একটা আর্টের বইতে একটা ছবি আছে কুইন ভিক্টোরিয়ার হাতে আঁকা ছবির স্কেচ্। উনি সেই ছবিটা দেখে লাফিয়ে উঠেছিলেন। শিশুর মতো হাততালি দিয়ে উঠেছিলেন পুলকে। বলেছিলেন—আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি, কিন্তু কুইনের হাতে আঁকা ছবি এখনো দেখিনি।

আর ছিল তাঁর প্রচণ্ড রসবোধ। সেবার যাচ্ছি পুরুলিয়ায়। হীরক রাজার দেশের শুটিংয়ের সময়। শীতের ভোর এসে থমকে দাঁড়িয়েছে হাওড়া স্টেশনে। প্লাটফর্মের এক জায়গায় বিরাট জটলা। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেই পরিচিত দীর্ঘদেহীটিকে। হঠাৎ এক অত্যুৎসাহীর প্রশ্ন ভেসে আসে—আচ্ছা আপনি তো গ্রাম বাংলা নিয়ে বহুদিন কোন ছবি করছেন না।

সত্যজিৎ রায়ের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো কেন আমি তো গ্রামবাংলা নিয়ে আগে অনেক ছবি করেছি। জনৈকের ক্ষোভ—যে তো অনেকদিন আগে। এতদিনে ধুলো পড়ে গেছে। খানিক নিস্তব্ধতা। তারপর, সত্যজিৎ রায়ের চলন্ত জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো

আমার বাড়িতে বন্ধু সত্যজিৎ

—একটু ঝেড়ে নেবেন। হাসিতে মুখরিত হয়ে উঠল সারা অঙ্গন।

আমার সঙ্গে সত্যজিতের শেষ দেখা নন্দীপের বিয়ের আসরে। আমাকে দেখে বলে উঠলেন—শরীরটাকে সারিয়ে তুলুন। আপনাকে যে আমার ভীষণ দরকার। অনেক বড় কাজ আছে। আজও তার ডাকের অপেক্ষায় বসে আছি। জানি সে ডাক আর পাবো না তবু সে কণ্ঠস্বরের অনুরণণ যে সবসময় কানে বাজে। আজ এই বিশ-পঁচিশ বছরের সখ্যতায় সে যে কখন বিমলবাবু ডাক ছেড়ে বিমলদা হিসেবে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়েছিল টেরই পাইনি। আজ সব ফাঁকা হয়ে গেল।

—০—

ফ্রিল্যান্স প্রেস ক্লাব, কলিকাতার পরিচালনায় সাংবাদিকতায় ৬ মাসের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি চলছে।

শিক্ষান্তে লেখার সুযোগ

দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকরা পড়ান

মাসিক বেতন ১০০ টাকা মোট ৬০০ টাকা

যোগাযোগ : ২, ছকু খানসামা লেন, কলিকাতা-৯

(শিয়ালদহ জগৎ সিনেমার পাশে) ফোন : ৫০-০৪৯৪

।। দুঃস্থ ও তপশীলীজাতি উপজাতিদের বিশেষ ছাড় ।।

মহাপ্রস্থানে সত্যজিৎ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে

চলচিত্র জগতের মহান সাধক সত্যজিৎ রায়ের মহা-প্রস্থানের অন্তিম যাত্রায় সেদিন (২৪ শে এপ্রিল) আবাল বৃদ্ধ বনিতা চোখের জলে বিদায় জানিয়েছিল বিশ্ববরেণ্য বঙালীর গর্ব সত্যজিৎ রায়কে। সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জানাতেও বহু বিদেশীনি উপস্থিত হয়েছিল নন্দনে, এমনকি তারাও এই মহান স্রষ্ঠার বিয়োগে চোখের জল ফেলেছিল। যে সব কলাকুশলীরা তার সান্নিধ্যে বা তার পরিচালনায় চলচ্চিত্রে কাজ করেছিলেন তাদের দুঃখ ব্যধা অনুভব করা কঠিন ছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল চোখের জলে বেদনায় তারা ম্যুহমান সাহিত্যিক সাংবাদিক রাজনৈতিক নেতারা ও সাধারণ মানুষেরা। প্রত্যেকের চোখের জল।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর লাল গোলাপের তোড়া দিয়ে মহান স্রষ্ঠাকে বিদায় করেণ।

লাখো দর্শক যারা তাঁর সান্নিধ্যেও আসেন নি, যারা তাঁর গুনমুগ্ধ, তারাও চোখের জলের ধারা ধরে রাখতে পারেনি।

২৪শে এপ্রিল ভোর ৫টা থেকেই দলে দলে নন্দনের গেটে এসে হাজির সবাই। শুধু একটিবার চাক্ষুষ দর্শন, একটি বার নমস্কার বা বিদায় সম্ভাস্বন জানানো দেশ বরেণ্যকে। বেলা যত বাড়তে থাকে ভীড়ও তত বাড়তে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে সমস্ত রকম সাহায্য করা হয়। মহাপ্রস্হানের অন্তিম যাত্রার পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল। তথ্যমন্ত্রি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সারাক্ষন ছিলেন।

এই মহান ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানাতে তিনি সব কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করেছিলেন ধীর স্হির ভাবে। কলকাতার পুলিসের সেদিনের ব্যবহারও ছিল দেখার মত। এই শব্দটির সঠিক ব্যাখ্যা সেদিন তাদের কর্তব্যপরায়নতা দেখে অভিভূত হতে হয়েছিল।

ছোট বড় নামী দামী পত্রিকার সব সাংবাদিকদের এরা যদি সহায়তা না করতেন তবে সাংবাদিক ফটো-গ্রাফাররা সত্যজিৎ রায়ের উপর এত কথা লিখতে পারতো না,শেষ ছবি তুলতে পারতো না। কিন্তু এদের ফোড়েদের হম্বিতম্বি একটু বেমানান হয়েছে। মহারাজ, বাংলা তথা বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের মহানিন্দায় শেষ শায়িত ছবি তুলে রাখতে সেদিন কয়েক হাজার ফটোগ্রাফার গিয়েছিলেন। সকলেই ছবি তোলার সুযোগ পেয়ে খুশি।

তেমনি যে সব অভিনেতা অভিনেত্রী বা ফিল্মএর সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিরা ছোট বড় সব কাগজের সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সত্যজিৎ রায়ের প্রতি তাদের অভিজ্ঞতা চোখের জলে বেদনায় শ্রদ্ধাবনতঃ হয়ে ব্যক্ত করেছেন

সেদিন লাখো মানুষের পায়ের চিহ্নে নন্দন এর প্রশস্ত পথ হয়ে উঠেছিল প্রয়াগের সঙ্গম। যে মানুষকে তিনি বার বার মেলাতে চেয়েছেন তিনি তাঁর সৃষ্টিতে সেই মানুষের বাঁধ ভাঙা ভীড় তাঁকে সেদিন অমর করে তুলেছিল।

তাঁর মহাপ্রয়াণে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হলো তা বোধ হয় আর পূরণ হবার নয়।

———

আমার শিশুকাল

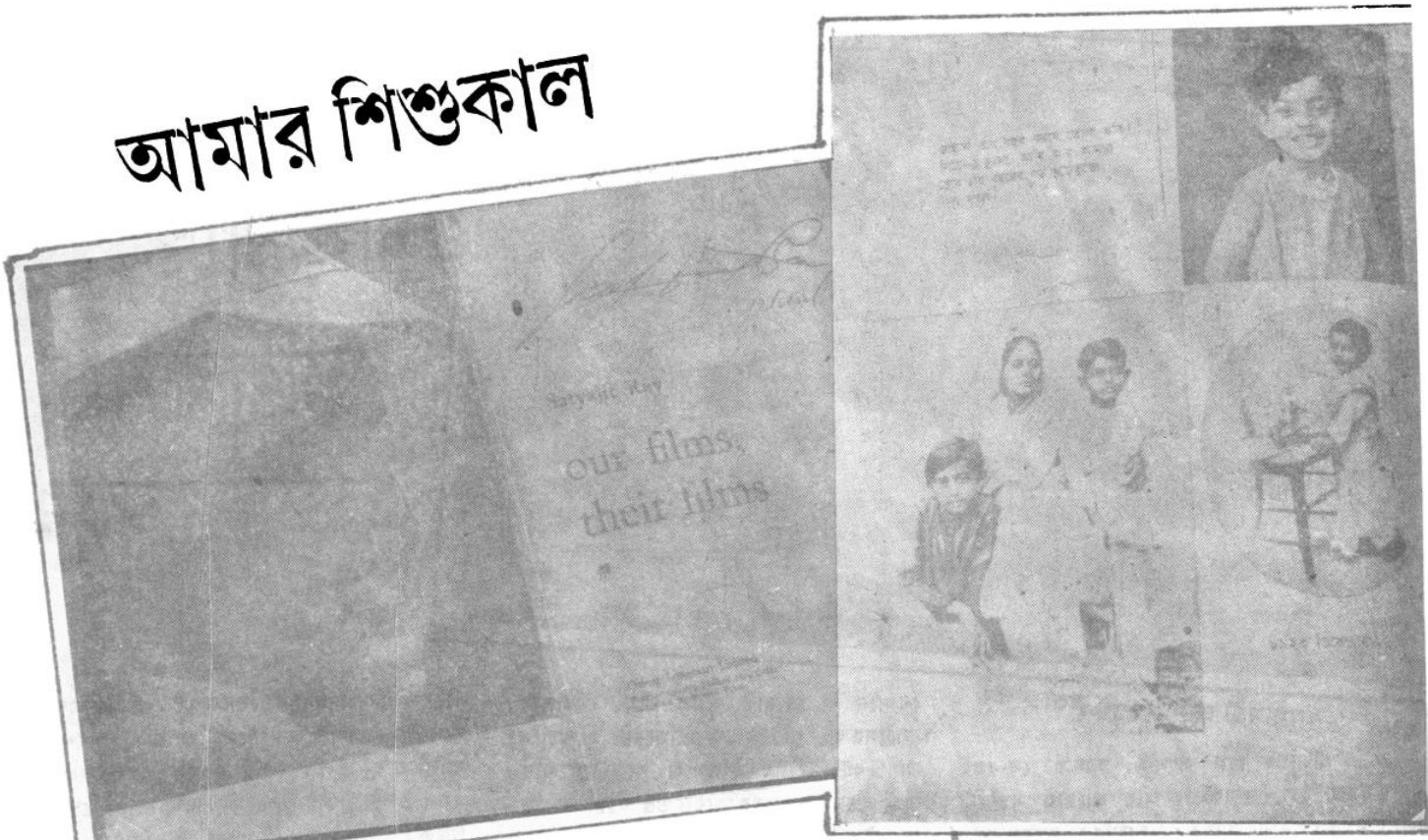

ছেলেবেলা কখন শেষ হয়? অন্যদের কথা জানি না, আমার মনে আছে যেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে এসে টেবিলের উপর থেকে মেক্যানিক্সের বইটা তুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হয়েছিল আমি আর ছোট নেই, এরপর কলেজ, এখন থেকে আমি বড় হয়ে গেছি।

ইস্কুল ছাড়ার বছর দশেক পরে কোনো একটি অনুষ্ঠানে, বোধহয় পুরোন ছাত্রদের সম্মেলনে—বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলে যেতে হয়েছিল। হলঘরে ঢুকে মনে হয়েছিল—এ কোথায় এলাম রে বাবা! এ ঘর কি সেই ঘর—যেটাকে এত পেল্লায় মনে হত? দরজায় যে মাথা ঠেকে যায়। শুধু দরজা কেন, সবই যেন ছোট ছোট মনে হচ্ছে—বারান্দা, ক্লাসরুম, ক্লাসের বেঞ্চিগুলো।

অবিশ্যি হবে নাই বা কেন। যখন স্কুল ছেড়েছি তখন আমি ছিলাম পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, আর এবার যে ফিরে এলাম, এখন আমি প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। স্কুল তো আছে যেই কে সেই বেড়েছি শুধু আমিই।

এর পরে আর স্কুলে ফিরে যাইনি কখনো। এটাও জানি যে যে-সব জায়গার সঙ্গে ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, যে সব জায়গায় নতুন করে গেলে পুরোন মজাগুলো আর ফিরে পাওয়া যায় না। আসল মজা হল স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে সেগুলোকে ফিরে পেতে।

ভাল ছবি কাকে বলে? ভাল গল্প মানেই কি ভাল ছবি? অনেকেই এমন কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে বাংলা-দেশের ছবির ইতিহাসে ভাল ছবির এত অভাব হলো কেন? বাল্মীকি বেদব্যাসথেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সেরা সাহিত্যিকদের কত ভাল গল্পই তো ছবি হয়ে দেখা দিয়েছে। কাহিনীর দৈন্য তো সেখানে ছিল না! তবে কিসের দৈন্য কিসের অভাব তাঁদের শিল্প সাফল্য থেকে বঞ্চিত করলো? আসলে কাহিনী মাত্রেরই দুই দিক আছে—এক হলো তার বক্তব্য, আর এক হলো তার ভাষা। এই দুটো মিলে গল্প। গল্পের আর্ট এই বলার ভঙ্গীতে। ভাল গল্প বলার দোষে নষ্ট হয়ে যায়, সামান্য কাহিনী বলার গুণে শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্র শিল্পও তার ভাষায়, তার বিন্যাসকৌশলে। যেখানে ভাষা দুর্বল, সেখানে গল্প ভাল হলেও ছবি শিল্প-সাফল্য লাভ করতে অক্ষম। চলচ্চিত্রের এই ভাষা ছবির ভাষা। পরিচালককে এই ভাষা জানতে হবে, এর ব্যাকরণ তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে।

আমরা জানি যে, রূপকথার রাজা শুধু বড় রাজা নন, তার হাতীসালে হাতী, ঘোড়াসালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মালিক, কুঠরী-ভরা মোহর। আমরা জানি, শুয়োরানীর 'সোনার খাটে গা রুপোর খাটে পা,' আর 'দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না।' রাজার যদি দাপট থাকে তাহলে আমরা জানি যে তার রাজ্যে 'বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়।' এক একটি ভবে প্রকাশের জন্যে এক একটি ডিটেলিং চিত্রের সাহায্য ছাড়া ভাবের প্রকাশ নেই বললেই চলে। রূপকথা ছেড়ে গীতি-কাব্যের মধ্যেও দেখা যাবে ডিটেলের ছড়াছড়ি। লেখক, কথক, কবিয়াল, পাঁচালিকার—সকলেই ভাব প্রকাশে বার বার ছবির আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ চিত্র রচনাই যাঁদের কাজ, তাঁরা ছবির কথা ভুলে যাবেন, ডিটেলের কথা ভুলে যাবেন, এর চেয়ে আক্ষেপের বিষয় আর কী হতে পারে?

আজ অবধি যে-ক'টা ছবিতে আমি নিজে সংগীত রচনার দায়িত্ব নিয়েছি তার মধ্যে চারুলতার সংগীত আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সাবলীল ও সুপ্রযুক্ত বলে মনে হয়েছে। এর একটা কারণ অবিশ্যি অভিজ্ঞতা। আবহ-সংগীতের কাজে অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। ছবির মেজাজ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকলেও কোন্ দৃশ্যে কোন্ বা কোন্ কোন্ যন্ত্রে কোন্ সুর কোন্ লয়ে কোন্ তালে বাজালে সেই মেজাজের সঙ্গে মিলবে, এ জ্ঞান সহজসভ্য নয়। তাই সংগীতের কাজে এখনও অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যায়। শেখারও আছে এখনও অনেক কিছুই। বিশেষত বাংলাদেশে—যেখানে জাতীয় জীবনে, মানুষের পোষাক—পরিচ্ছদে, কথাবার্তায় বাড়িঘরদোরের চেহারায় কোন স্পষ্ট চরিত্র নেই—সবই যেখানে পাঁচমিশেলি খিচুড়ি, সেদেশের পটভূমিকায় আধুনিক ছবির আবহসংগীত রচনা এক দুরূহ ব্যাপার। অথচ এ চ্যালেঞ্জ এড়ানো চলে না।

—

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে আমার যে-রকম মুগ্ধতা ছিল, সে-রকমটা আর কারোও সম্পর্কে কখনও হয়নি আমার। সত্যজিৎ রায়ের ছবি আমি প্রথম দেখি দেশ পত্রিকার পাতায়, বছর তিরিশ আগে। ছবিটা পষ্ট মনে আছে। মাধবী দোলনায় বসে, পেছনে হাসিমুখে সত্যজিৎ তাঁকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। ছবিটার মধ্যে আকর্ষনীয় কিছু ছিল না। কিন্তু আমি যে আকৃষ্ট হই তার কারনটা একেবারে আলাদা। শুনলে অনেকের হাসি পেতে পারে। আমার এক প্রিয় আত্মীয়র চেহারার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের মুখের ভাবে একটা মিল তখন আমি পেয়েছিলাম। পরে বেশ কিছুদিন সত্যজিৎ-এর কোনও ছবি কোথাও দেখলেই আমি ঐ একই কারনেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তারও পরে অবশ্য এ-মিলের ব্যাপারটা আর বড় ব্যাপার ছিল না আমার কাছে। কিন্তু সত্যজিৎ এর ছবি আমাকে টানতেই থাকে। আমার মনে হতে থাকে যে এ-চেহারায় এমন কিছু একটা রয়েছে যা আর পাঁচটা লোকের চেয়ে আলাদা। তখনও সত্যজিৎ-এর কোনও ছবি আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। যদিও পড়েছিলাম উনি একজন আন্তর্জাতিক সম্মান প্রাপ্ত শিল্পী।

সত্যজিৎ রায়ের যে ছবিটা প্রথম দেখি সেটা 'পথের পাঁচালী'। তখন আমার বয়স সম্ভবত বছর এগারো। তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে কোনও এক মাঠে টাঙানো পর্দায় খোলা আকাশের নীচে পথের পাঁচালী দেখি। সে বয়সে ছবি বোঝার ক্ষমতা আমার হয়নি। আরও কিছুদিন পর্যন্ত সত্যজিৎ-এর অন্য কোনও ছবি আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। যদিও তাঁর সম্পর্কে কাগজে যেখানে যা বেরোত আমি পড়ে ফেলতাম। মিসটনের বই 'পর্টিট্রে অফ এ ডিরেক্টর : সত্যজিৎ রায়' বইটি আমি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি। এবং সত্যজিৎ রায়ের আরও ভক্ত হয়ে উঠেছি। কথা উঠতে পারে সত্যজিৎ রায়ের অন্তত কিছু ছবি না দেখেই কীভাবে তাঁর ভক্ত হয়ে উঠলাম। উত্তর হল, চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের নয়, ব্যক্তি সত্যজিৎ রায়েরই আমি ভক্ত। আজ পর্যন্ত। তাঁর সম্পর্কে পড়ে পড়েই এই মুগ্ধতা আমার গড়ে উঠেছিল।

সত্যজিৎ রায়কে অবশ্য আমি দেখি অনেক পরে। উনআশি সালে 'হীরক রাজার দেশে' তৈরীর সময়। এখানে বলে নিই আমি পুরুলিয়ার ছেলে। ঐ ছবির শুটিং হয়েছিল ওখানে। আমার এক তুতো ভাই পাপা কীভাবে যেন সত্যজিৎ রায়ের প্রডাকশন ইউনিটের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল। তো এক সকালে আমি সাইকেলে চেপে বাপ্পার বাড়ি যাওয়ার পথে একটা বাঁকে সাইকেল জোরে ঘুরিয়েছি অমনি একটা নীল অ্যাম্বাসাডর ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে সাইকেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি ড্রাইভারের পাশে বসে সত্যজিৎ রায়। চোখাচোখি হওয়ায় আমার বুকের স্পন্দন গেল থেমে। ও'কে দেখব, না সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াব সেটা ঠিক করতেই কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল। এরপরে বেশ কয়েকবার ত'ার অতি নিকটে গেছি, তাঁর থেকে ইঞ্চি ছয়েক দূরেও, একসঙ্গে ছবিও তুলেছি কিন্তু কথা বলা হয়ে ওঠেনি। সুযোগের অভাবে নয়। ও'কে কী জিজ্ঞেস করে ওঠা যায় সেটা ভেবে উঠতে পারিনি।

ব্যক্তি সত্যজিৎ-এর শৃঙ্খলা বোধ, বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য, অসম্ভব ভদ্রতাবোধ ইত্যাদি অনেক গুনের কথা শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম। কিন্তু ও'কে দেখে আমার প্রত্যেকবারই যে জিনিসটা মনে হয়েছে সেটা হল নিজের ওপর এক বিশাল আস্থা ও'র ছিল। ও'র চলনে এবং বলনে এমন একটা প্রত্যয় ছিল যেটা ভীষনভাবে চোখে পড়ত। তিনি যেখানে, সেখানে একমাত্র যেন তিনিই সবকিছু ছেয়ে, বাকীরা আর কেউ কিছু নয়—এই একটা জিনিস অবধারিতভাবে মনে হত। ষষ্ঠিব্রত চক্রবর্তী. (যিনি ষষ্ঠি ব্রাটা নামে একসময় বেশ পরিচিত ছিলেন) একবার ও'র সম্পর্কে 'ম্যাজেস্টিক' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন এর থেকে ভাল শব্দ বোধহয় সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে আর হয় না। সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে অনেক প্রশংসা এবং সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ত'ার ছবির বিরুদ্ধে য'ারা বলেন তাঁরাও স্বীকার করবেন যে সামগ্রিক বিচারে সত্যজিৎ যে মাপের মানুষ তার ধারে কাছে আমার মতে কেউ ও'ার জীবৎকালে ছিলেন না, অদূর ভবিষ্যতেও যে কেউ হবেন এমনটাও দেখা যাচ্ছে না। যে শূন্যতা তিনি আমাদের দিয়ে গেলেন তা নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। হয়ত বরাবরের জন্যে।

অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকেই আমি দেখিনি। তাতে খুব একটা দুঃখ হয় না। এমনকি উত্তমকুমারকেও আমি দেখিনি। আক্ষেপ নেই তাতেও। কিন্তু সত্যজিৎ রায়কে একবারও যদি চাক্ষুষ না দেখতাম, জীবনভোর একটা কষ্ট মনে রয়ে যেত। রবীন্দ্রনাথকে য'ারা দেখেছেন এমন জীবিত ব্যক্তিদের প্রতি আমার হিংসে হয়। কিন্তু তাঁকে দেখার কোনও উপায় ছিল না আমার। আমার জন্মের বারো বছর আগেই তিনি মারা যান। কিন্তু সত্যজিৎ রায়কে দেখে যদি বুড়ো বয়সে নাতি নাতনীদের কাছে তাঁর কথা বলতে পারব এটাইতো আমার একটা বড় গর্বের ব্যাপার হয়ে রইল।

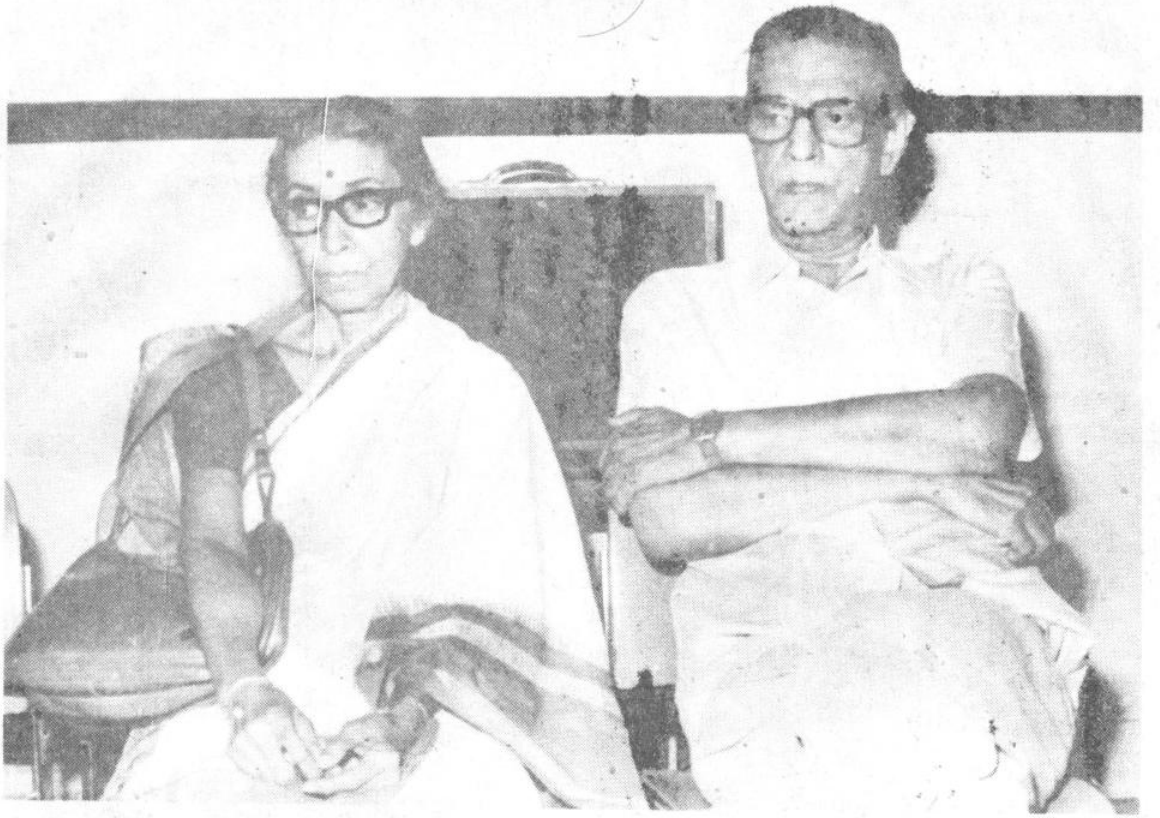

পথের পাঁচালী-র সর্বজায়া করুনা বন্দ্যোপাধ্যায় সাথে সত্যজিৎ রায়

চিহ্ন তব রেখে গেছো, তুমি হেথা নাই। সস্ত্রীক সত্যজিৎ আলাপরত তৃপ্তি মিত্রর সাথে

'নন্দন'-এ শম্ভু মিত্র ও রবিশংকরের সঙ্গে

'নায়ক' রিহার্সালে উত্তমকুমারের সঙ্গে। ছবিঃ মোনা চৌধুরী।

ঘরে বাইরে সত্যজিৎ

নীরব রায়

"গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের ওপর বেশ উঁচুতে ক্যামেরাটা বসানো হল । প্রথম শটটা হল অপু কাশবনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে ক্যামেরার দিকে আসছে । তার মাথায় সেই রাংতার মুকুট আর হাতে একটা আখের টুকরো । আমার ওপর দায়িত্ব পড়ল আমি কাশবনের আড়ালে বসে থাকব বংশীবাবু রুমাল নাড়লে আমি অপুর গায়ে ঠেলা দেব অপু চলতে শুরু করবে । দু-একবার হাঁটা হল সত্যজিৎ বাবুর পছন্দ হল না । তখন অপুর যাওয়ার পথে কিছু কিছু বাধা সৃষ্টি করা হল যাতে সেগুলো ডিঙিয়ে ওকে যেতে হয় । তাছাড়া এদিকে ওদিকে কিছু লোককে রাখা হল। তারা মাঝে মাঝে ডাকবে —যখন যেদিক থেকে ডাকবে অপু সেই — সেই দিকে তাকাবে ।---তখনও সত্যজিৎ বাবু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হন নি। তিনি তখন অপুকে বললেন হাঁটতে হাঁটতে একটা বিশেষ জায়গায় এসে পা-টা পিছন দিকে তুলে হাত দিয়ে একটু চুলকে নিতে । বংশীবাবু সেই জায়গাটা একটা চিহ্ন দিয়ে রাখলেন যাতে অপু বুঝতে পারে কোথায় চুলকোতে হবে । শট নেওয়া শুরু হল। বংশীবাবু রুমাল নাড়লেন আমি অপুকে ঠেলে দিলাম । অপু চলতে শুরু করল । আমি আড়ালে বসে আছি, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অনেকক্ষণপর আমি শট শেষ হয়ে গেছে মনে করে উঠে দাঁড়ালাম। ক্যামেরার কাছে যারা ছিলেন তারা সব হৈ-হৈ করে উঠলেন। তখনো শট শেষ হয়নি । "পথের পাঁচালি"-র প্রথম শটটা আমার জন্য এন-জি হয়ে গেল—লিখেছেন পথের পাঁচালির প্রোডাকশন ম্যানেজার শ্রী অনিল চৌধুরী ।

যে চলচ্চিত্রের প্রথম শটটি এন-জি হয়ে গেল, সেই চলচ্চিত্রটিই চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গভীর দাগ কেটে গেল । সমস্ত শিল্পী, স্রষ্টা আপন সৃষ্টিতে স্বতন্ত্র । মৌলিক বৈশিষ্ট্যে ভরপুর । তাই কোন শিল্পীর সঙ্গে অন্য কোনও শিল্পীর তুলনা করাটা অযৌক্তিক । চলচ্চিত্রকে যারা শিল্প প্রকাশের সামগ্রিক মাধ্যমে উন্নীত করতে চলেছেন, নিত্য নতুন বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন তাদের অনেকের শিল্প সৃষ্টির ধারা বা ভঙ্গী এখনো দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিষ্ঠা পাইনি । আবার কিছু কিছু শিল্পী তাদের মৌলিক কাজের ভেতর দিয়ে এই মাধ্যমকে করে গেছেন অলঙ্কারময় ।

সত্যজিৎ রায় ছিলেন এমনই একজন চিত্রপরিচালক যিনি ধারাবাহিক ভাবে প্রথম দিকে তৈরী তাঁর সব ছবিতে ঢেলে গেছেন তার সংগ্রহ করা সমস্ত সম্পদ । সেই সম্পদে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় চলচ্চিত্র তেমনি বিশ্ব চলচ্চিত্রেও তা দাগ রেখেছে । যে কারণে আইজেনস্টাইন, রেনোয়া, আন্তনিওনি, ডিসিকা, ফেলিনি, কুরোসাওয়াদের পাশাপাশি নাম উচ্চারিত হয়ে এসেছে সত্যজিৎ রায়ের ।

তার প্রথম ছবি যে কাহিনী অবলম্বনে সেই 'পথের পাঁচালী' কিন্তু কাহিনী প্রধান নয় অনুভূতি প্রধান । বাংলাদেশের গ্রমীণ পরিবেশে একটি প্রাণের জন্ম এবং এই পরিবেশেই তার শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণ । অপুর ওপর প্রভাব তার দিদির । সমগ্র পথের পাঁচালী-র কেন্দ্র চরিত্রই দূর্গা। দূর্গা প্রকৃতি কন্যা । গ্রামবাংলার বনে প্রান্তরে তার অবাধ বিচরণ । ভায়ের প্রতি প্রাণ ঢালা স্নেহ । সঙ্কীনর্তা আবার অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ । বলা যেতে পারে পশ্চিমবাংলার একটি অণু এই "নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম" আর সেই নিশ্চিন্দিপুরের স্নায়ুকোষগুলির একটি অপু একটি দূর্গা । এমন একটি ছবির মত সাহিত্যকে চলচ্চিত্রের রূপ দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় ।

"পূর্ব দিন ছিল একাদশী । হরিহরের দূর সম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাকরুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চাল ভাজার গুড়া জলখাবার খাইতেছে । হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব পযর্ন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না । ইন্দির ঠাকরুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না ? — ওই দ্যাখো" । 'পথের পাঁচালী'র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ পড়েই পাঠক নিশ্চয় বুঝছেন কতটা 'সিনেমাটিক' গুণ এই সাহিত্যের ভেতর রয়েছে ।

সত্যজিৎ রায় এমন একটি কাহিনীকে নির্ভর করে চলচ্চিত্র তৈরী করবেন ঠিক করে যাদের অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করলেন তারা কেউই কিন্তু ছিলেন না চলচ্চিত্রের অভিনেতা। তখন থেকেই তিনি সম্ভবতঃ মনে মনে পোষন করতেন সেই ধারণা যা নায়ক ছবিতে তিনি বলিয়েছেন নায়কের গুরু শঙ্করদার মুখ থেকে "অভিনেতারা সকলে পুতুল । সে পরিচালকের হাতের পুতুল, সে ক্যামেরাম্যানের হাতের পুতুল, সে প্রয়োগবিদদের হাতের পুতুল -------" তাই তিনি সর্বজয়া-র ভূমিকায় নিলেন করুণা বন্দোপাধ্যায়কে । যিনি ছিলেন গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্যা । এই সঙ্ঘের শিল্পী হিসেবে কয়েকটি মঞ্চে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ছিল মাত্র তার । দূর্গার ভূমিকায় উমা দাশগুপ্তা তখন কলকাতায় এক স্কুলের ছাত্রী । এটাই উমার প্রথম এবং শেষ অভিনয় । ইন্দির ঠাকরুণের ভূমিকায় চুনীবালা, সত্যজিৎ রায়ের একটি স্মরণীয় আবিষ্কার। বহুকাল পূর্বে চুনীবালা কলকাতায় বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত পেশাদার অভিনেত্রী ছিলেন । তারপর দীর্ঘ তিরিশ বছর অভিনয় জীবন ছেদ পড়ে । তার কন্যাই ছিলেন পরবর্তীকালে নিভাননী দেবী । এই পলিতকেশ প্রায় আশী বছরের বৃদ্ধার ইন্দির ঠাকরুণের ভূমিকায় অভিনয় বিশ্ব চলচ্চিত্রের অভিনয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা । বিভিন্ন সময়ে তার মুখের ভাবান্তর, অতি স্বাভাবিক

অভিনয় । শিল্পচিত মন এবং শিল্পের জন্য সব কিছু করা ।

একবার দেখা যাক এই সুযোগে এখানকার সত্যজিৎ রায়ের তৈরী চিত্রনাট্যের অংশটুকুঃ অপু-দুর্গা খেলতে খেলতে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যের পথ দিয়ে এগিয়ে আসে । (নেপথ্যে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ)

দুর্গা ইন্দিরকে দেখতে পেয়ে তার কাছে আসে, ভাবে পিসি ঘুমিয়ে পড়েছে । পিসির মাথাটা হাঁটুর ওপর নুয়ে পড়েছে । দুর্গা আস্তে মাথাটা তোলার চেষ্টা করে, পারে না । তখন দুর্গা পিসির হাঁটু ধরে ঝাঁকায় । অপু পাশে দাঁড়িয়ে থাকে । দুর্গা পিসি! ও পিসি !

(কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শেষ)

দুর্গা পিসিকে জাগাবার চেষ্টা করে

দুর্গা পিসি ! পিসি !

পিসির দেহটা একপাশে গড়িয়ে পড়ে যায় । মাথাটা ঠক করে মাটিতে লাগে । দুর্গা ভয় পেয়ে নিচু হয়ে পিসির মুখটা দেখার চেষ্টা করে ।

দুর্গা (ফিস ফিস করে) পিসি !

ভয়ে দুর্গা পিছিয়ে যায় । তার পায়ে লেগে ইন্দিরের ঘটিটা পুকুরপাড় দিয়ে গড়িয়ে ডোবায় পড়ে যায় । দুর্গা অপু ডোবার উপর দিয়ে দৌড়ে চলে যায় ।

দূরে দেখা যায় অপু দুর্গা ছুটে পালাচ্ছে, সঙ্গে বাছুর । ক্যামেরা নীচের দিকে নেমে ইন্দিরের মুখের উপর থামে মৃত ইন্দিরের মুখের উপর একটা মাছি খেলা করে বেড়ায়। (নেপথ্যে ইন্দিরের গলায় 'দিন ত গেল সন্ধ্যা হল' শোনা যায়) ।

Dissolve

শ্মশানযাত্রীর দল ইন্দিরের মৃতদেহ নিয়ে চলেছে । (ইন্দিরের গান চলছে) ।

শিল্পের জন্য সবকিছু করা মনভাব নিয়েই তিনি ঐ বয়সে অমন করুণ দৃশ্যে অভিনয় করে সমস্ত বিশ্বজগতকে চমকে দেন। সত্যজিৎ রায়ের নিজেরও দ্বিধা ছিল এই দৃশ্য গ্রহণের ব্যাপারে । কিন্তু চুনীবালা হাসি মুখে সেই অভিনয় করলেন । মৃত ইন্দির ঠাকরুণকে খাটের সঙ্গে বেঁধে তাকে গঙ্গাযাত্রা করান হচ্ছে দড়ি দিয়ে বাঁধার ক্লেশ তো আছেই আর আছে নিজেকে সম্পূর্ণ মৃত ভেবে নেবার মানসিক বল ।

পথের পাঁচালীতে অভিনয়ের কয়েক বছর পরই চুনীবালার মৃত্যু হয় । স্মরণীয় চিত্র হিসেবে ব্রিটিশ আর্ট গ্যালারীতে একটি চিত্র রক্ষিত আছে ইন্দির ঠাকরুণ ও দুর্গা—জীবনের দুই প্রান্ত । প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যাতে নিটোল ভারতবর্ষের চিত্র ।

সত্যজিৎ রায় এমনভাবেই পুরোন প্রতিভার সঙ্গে নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রী মিশিয়ে তৈরী করেছিলেন এই চিত্র । এক একজন শিল্পীর নির্বাচন উপলক্ষে কি পরিমান অধ্যাবসায় তিনি দেখিয়েছেন তা আজ বহুল প্রচারিত । কানু বন্দোপাধ্যায়ের চুল সেলুনে কাটা ছিল বলে কতদিন অপেক্ষা করা হয়েছে চিত্র গ্রহনের জন্য । এসব ঘটনা উল্লেখ করবার একটাই কারণ যে চরিত্র সম্বন্ধে পরিচালকের স্বচ্ছ দৃষ্টি বা ধারণা না থাকলে ভাল অভিনয় পাওয়া যায় না ।

সত্যজিৎ-চলচ্চিত্রের অভিনয়রীতি খুব সর্তকভাবে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যায় যে চরিত্রগুলি অভিনয়কালীন প্রত্যেকেই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত । একেবারে চুপচাপ সংলাপ উচ্চারণেই এদের কাজ শেষ হয় না । প্রত্যেকেই এমন আচরণ বা ভাবভঙ্গি করেন যেন মনে না হয় এটা অভিনয় চলছে। পরিচালকের যথেষ্ট স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকলে এমনটা সম্ভব নয় ।

এর সঙ্গে সোনায় সোহাগা হিসেবে পেয়েছিলেন সৃষ্টিশীল শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তকে । শেয়ালকোটে জন্ম এই পাঞ্জাবী শিল্পী যিনি ছাত্রজীবলে কখনও ভাবেননি শিল্পী হবেন । তিনিই শিল্প নির্দেশক হয়ে গেলেন সত্যজিৎ রায় কৃত চলচ্চিত্রের । কারণ ইতিপূর্বে ১৯৪৯ সালে বিশ্বখ্যাত ফরাসী পরিচালক রেনোয়া কলকাতায় আসেন তার 'রিভার' ছবি করতে । সত্যজিৎ রায় বংশী চন্দ্রগুপ্ত উভয়েই রেনোয়ার সংস্পর্শে আসেন দিনের পর দিন । অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন ঐ পরিচালকের কাজ রেনোয়ার সঙ্গে এসেছিলেন আর এক জ্যোতিষ্ক ডিজাইনার ইউজেন লুরি । সেই ডিজাইনিং-এর কাজ বংশী চন্দ্রগুপ্ত লুরির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন তা বহুবার ব্যক্ত হয়েছে শিল্পীর মুখ থেকে । চরিত্রগুলি এবং তার পারিপার্শ্বিক-তাকে বাস্তবানুগ করে তুলেছেন শিল্প নির্দেশক। এখানেই আর একজনের নাম উল্লেখ না করলে ফাঁকি থেকে যায় তিনি ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র । এমনভাবেই সত্যজিৎ রায় যাত্রা শুরু করেছিলেন নিজে এবং একগুচ্ছ প্রতিভাকে পাশে রেখে ।

সত্যজিৎ রায়ের একটি বিশেষ দিক চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে অভিনেতা নির্বাচন । যে জন্য বারবার নায়ক বা নায়িকা খুঁজে বের করতে হয়। হরিহরে-কানু বন্দোপাধ্যায়, চারুলতায় —শৈলেন মুখার্জী, সীমাবদ্ধ-য় বরুন চন্দ, গুপীর ভূমিকায় তপেন চট্টোপাধ্যায়, প্রতিদ্বন্দীতে—ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, জন অরণ্যে—সোমনাথের ভূমিকায় প্রদীপ মুখোপাধ্যায়দের যেন নকল মনে হয় না। পার্শ্ব চরিত্রের ক্ষেত্রে অভিযানে—ওয়াহিদা রহমান, অরণ্যের দিনরাত্রিতে —সিমি, গুপীগাইনে—সন্তোষ দত্তের ডবলরোল, মহাপুরুষে চারুপ্রকাশ রায় যেন অপরিহার্য্য ।

আবার কিছু কিছু কাহিনী নির্বাচন তিনি করেছেন কিছু অভিনেতাকে কল্পনায় নিয়েই । যেমন ছবি বিশ্বাসের জন্য 'জলসাঘর', তুলসী চক্রবর্তীর জন্য 'পরশপাথর' এবং 'নায়ক' উত্তম কুমারের জন্য ।

প্রত্যেক বড় বড় চলচ্চিত্রকার নিজস্ব একজন নায়ক তৈরী করে নেন । অর্থাৎ যিনি পরি-চালকের ইচ্ছেটা বুঝবেন। কুরোসাওয়ার মিফুনে, বার্গম্যানের ম্যাক্সভন সাইডো, বিবি অ্যাণ্ডারসন, গোদারের ক্যারিনা, ফেলিনির গ্লুইটা, ডিসিকার সোফিয়া সত্যজিৎ রায়ের যেন তেমনিই—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

"রবিশঙ্কর এলেন কলকাতায় মিউজিক রেকর্ডিং-এর জন্য । কিন্তু তাঁকে তখন ছবি দেখাবার সময় নেই । সেদিন দুপুর দেড়টার সময় টালিগঞ্জের ভবানী সিনেমাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'পথের পাঁচালী' ছবিটা একবার একটু দেখাতে পারেন ? ওরা বলল, 'আমাদের ম্যাটিনি শো তো শুরু হয়ে যাবে, আড়াইটেয় লোক ঢুকবে । তার আগে যতটা পারেন দেখে নিন ।' আমরা মোটে সাতরীল ছবি রবিশংকরকে দেখাতে পেরেছিলাম। ওখান থেকে সোজা চলে এলাম টেকনিসিয়ানস স্টুডিওতে । ভোর চারটে পর্যন্ত ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক রের্কডিং হল নানাভাবে সত্যজিৎবাবু তাঁকে দিয়ে বেশ কিছু অংশ করিয়ে নিলেন — পরে যাতে দরকার মত সেগুলো বসাতে পারেন বলেছেন প্রোডাকসন ম্যানেজার অনিল চৌধুরী। সত্যজিৎ রায় ছবি করেছেন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ২৮টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ৭টি এবং নির্বাক স্বল্প দৈর্ঘ্যের ১টি । এর ভেতর প্রথম চারটিতে রবিশংকর, জলসাঘরের জন্য বিলায়েৎ খান এবং দেবীর জন্য আলীআকবর খান সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন । ১৯৬১-র 'তিনকন্যা' থেকে তিনি তার সব ছবিতে সঙ্গীত করিচালনা করেছেন।

সিনেমা তৈরীকে যদি পরপর কটি পর্বে ভাগ করি তবে সঙ্গীত হচ্ছে এর চতুর্থ স্তর । প্রধান

তিনটি স্তর চিত্রনাট্য, চিত্র গ্রহন এবং সম্পাদনা। সত্যজিতের চিত্রনাট্যে থাকে ধারা-বাহিক সরল বিবরণ এবং চরিত্রের ডিটেল । চিত্রনাট্যের কাজ মূলত কাঠামোগত । চিত্রগ্রহণের মাধ্যমে এই কাঠামোকে রূপ দেওয়া হয় । সম্পাদনার পর্বে চিত্রনাট্যের সেই মূল বর্ণনার পরম্পরা রক্ষা করেন। তিনটি পর্বের পর যে নতুনমাত্রা যুক্ত হয় তাই হচ্ছে সঙ্গীত । কিন্তু সঙ্গীত বর্ণনা নির্ভর নয় । তার সঙ্গীতের চরিত্রও আলাদা । তিনি বলেছেন "আই ডোন্ট লাইক দ্য মিকি মাউসিং অফ মিউজিক বাই প্রোভাইডিং সঙস উইথ এভরি অ্যাকশন ।" প্রত্যেক দৃশ্যেই তিনি সাংগীতিক ইলাসট্রেশনে বিশ্বাস করেন না । কোন দৃশ্যের নাটকীয় সংঘাতের যে বাহ্যিকরূপ থাকে সেটাকে সমর্থন করে তিনি সঙ্গীত গড়ে তোলেন না । বরং দৃশ্যের অন্তর্নিহিত যে গভীর তাৎপর্য্য থাকে যা নির্ভর করে গড়ে ওঠে সিনেমার কাঠামো তাকেই রূপদান করেন সংগীতে । তাই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গীত বাহ্যিক নয় । সিনেমার শরীরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকে । 'অশনি সংকেতে' মতির মৃত্যু দৃশ্যে সেই পাখীর কর্কশস্বরই ওই দৃশ্যের জন্য শ্রেষ্ঠতম আবহসঙ্গীত । আবহসঙ্গীত চলচ্চিত্রের মেজাজকে ঘিরে গড়ে ওঠে । এই সঙ্গীত যে যন্ত্র নির্ভর হতেই হবে তেমন কোন কঠোর গোঁড়ামিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না । 'তিনকন্যা' ও 'পোষ্টমাষ্টার' গ্রাম্য পরিবেশের ছবি। এই ছবির উপাদান ছিল পাত্রপাত্রীর সরল আচরণ ও কথাবার্তা। তাই এর আবহসংগীতে বাঁশী, দোতারা ও সারিন্দা এই তিনটি যন্ত্র ছাড়া আর কোন যন্ত্র তিনি ব্যবহার করেননি । আবার কাঞ্চনজঙ্ঘায় একদিকে পাহাড় অন্যদিকে মিশ্র সংস্কৃতি তাই এই ছবির আবহসঙ্গীত পাহাড়ী লোকসঙ্গীতের সুর ইচ্ছামত ভেঙে দেশী ও বিলাতী যন্ত্রে একক ও সমবেতভাবে বাজিয়ে এ ছবির মেজাজ আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল । এইভাবে তার ছবিতে শুধু প্রয়োজনে আবহসঙ্গীত এসেছে । সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা বুঝতে হলে তার সঙ্গীতকেও বুঝতে হবে। চলচ্চিত্রের কাঠামোর পরতে পরতে জড়িয়ে আছে, সঙ্গীত। একে পৃথক করা শক্ত, আলাদা করাও ঠিক নয়, কারণ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে এর অবস্থান। তবে তার নিজের বক্তব্যে বলতে হয় সঙ্গীতের প্রয়োগের সীমানা তিনি কমিয়ে নিয়ে আসছিলেন।

প্রথম চলচ্চিত্র থেকেই সত্যজিৎ রায় তার নিজস্ব চলচ্চিত্র ভাষা তৈরী করে নিয়েছিলেন। সত্যজিতের ছবিগুলো মন দিয়ে দেখলে এটা ধরা পড়ে । অপু ত্রয়ীর প্রথম দুটি পর পর 'পথের পাঁচালী (১৯৫৫) এবং 'অপরাজিত' (১৯৫৬) তৈরী হবার পর 'পরশপাথর' (১৯৫৮) এরপর এল 'জলসাঘর' (১৯৫৮)। এই চারটের পর তিনি সম্পূর্ণ করলেন অপু ত্রয়ীর শেষ ছবি 'অপুর সংসার' (১৯৫৯) । এরপর আমাদের সংস্কারকে তীব্র ভাষায় কষাঘাত করে তৈরী হল 'দেবী' (১৯৬০) । ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ তথ্যচিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প নিয়ে তৈরী হল 'তিনকন্যা' । এরপরের ছবি আগেই উল্লেখিত প্রথম রঙীন ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২) । এরপরের ছবি 'অভিযান' (১৯৬২) ছবির চিত্রনাট্য করতে অনুরোধ করেছিলেন ঐ ছবিরই প্রযোজক বিজয় চট্টোপাধ্যায় । বিজয়বাবুর জন্য চিত্রনাট্য করতে গিয়ে আউটডোরে দুবরাজপুরে (যেখানে শুটিং হয়েছিল) গেছিলেন ।

বাংলা বিহার সীমান্তের এই গ্রামের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ দেখে নিজেই ছবিটি করতে উৎসাহ দেখান । গ্রামের একটি শ্রেণীর অবক্ষয় নিয়ে এই ছবি । ছবিটি কলকাতায় যখন রিলিজ হয়েছিল তখন 'সপ্তপদী'-র মত সুপারহিট ছবি শহরে দাপাচ্ছে । তা সত্ত্বেও 'অভিযান' টানা সতের সপ্তাহ চলেছিল, সাত সপ্তাহ ছিল 'হাউসফুল' । অভিযানের পর আধুনিক কাহিনী 'মহানগর' (১৯৬৩) — প্রতিবাদের ছবি । নারীর প্রতিবাদ। ১৯৬৪তে 'টু' স্বল্প দৈঘ্যের নির্বাক ছবি করেন । পরের চলচ্চিত্র রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় অবলম্বনে 'চারুলতা' (১৯৬৪) । এই ছবি তৈরী করে তিনি এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন যে তিনি বারবার বলেছেন 'চারুলতা' তিনি আবার যদি করেন তবে ঐ একই ভাবে করবেন । নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ের ভাবনাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন চারুলতায় সত্যজিৎ রায় । প্রতিটি ফ্রেমের পেছনে গভীর অনুসন্ধানের ছাপ । 'পিরিয়ড'কে সঠিক ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা এখানে পুরোপুরি সফল । চারুর মনের দ্বন্দ্বসংঘাত যন্ত্রণা, ব্যক্তিত্বের উন্মোচন। চারু নিঃসঙ্গ ভূপতি বোঝে । চারুলতার ভেতর সাহিত্যিক প্রবণতাকে উৎসাহিত করতে গিয়ে অমল যে চারুর সুপ্ত মনের এক অপ্রত্যাশিত শিকড় স্পর্শ করে ফেলে এটা অতি স্বাভাবিকতা। ভূপতি এবং চারুর মানসিক ব্যবধান পাশাপাশি অমল-চারুর নৈকট্য ছন্দময় ভাবে উপস্থাপিত। একটি ধ্রুপদী চিত্র বলা যেতে পারে ।

এরপর প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা দুটি ভিন্ন স্বাদের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' (১৯৬৫) এর চলচ্চিত্রায়ন। একটি প্রেমের গল্প আর একটি ভণ্ড সাধুর গল্প । এরপরের ছবি পরিচালকের নিজের লেখা 'নায়ক' (১৯৬৬) । অরিন্দম মুখার্জী পুরস্কার আনতে দিল্লি যাচ্ছেন ট্রেনে । ট্রেনের ভেতরেই কাহিনীকাল । ১৯৬৭তে গোয়েন্দা কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'চিড়িয়াখানা' । এরপরের ছবি যুদ্ধ বিরোধী সঙ্গীত নির্ভর চিত্রনাট্য 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৮)। বক্তব্যবাহী সঙ্গীতময় চলচ্চিত্র । কয়েকদিন ছুটি কাটাতে শহর থেকে আসা চারজন যুবকের প্রকৃতির আদিম পরিবেশে মধ্যবিত্তের চেহারাগুলি বেড়িয়ে পড়ে 'অরণ্যের দিনরাত্রিতে' (১৯৬৯) যদিও এরা সমস্ত যুব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না, তবুও নানা মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। বেশ কটি প্রধান চরিত্র নিয়ে এমন একটি চলচ্চিত্র শৈলী আমাদের দেশে প্রথম । প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০) বেকার যুবকের কাহিনী । 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১) চাকুরীরত মধ্যবয়সীর কাহিনী । এই বছরেই তিনি আর একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি করেছিলেন সিকিম। ১৯৭২-এ তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষক শ্রীবিনোদবিহারীকে নিয়ে তৈরী করেছিলেন স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র 'দ্য ইনার আই' । ১৯৭৩-এ 'অশনি সংকেত' ।

হিন্দি ছবিতে যে রঙের ব্যবহার আমরা দেখি সে রঙ মোহময়ী রঙ । বাস্তবকে ভুলিয়ে দেশী বিদেশী নিসর্গশোভা দেখিয়ে একটি ফাঁপা চটকদার ফানুসের মত মায়ার জগতে নিয়ে যাবার চেষ্টা থাকে সেখানে । সত্যজিৎ রায়ের প্রথম রঙীন ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "আট নটি প্রধান চরিত্রের পোষাক নির্বাচনে সেই সব চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিগত রুচি, মানসিক অবস্থা — এ সব কিছুরই ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা ছিল । সাদা কালোয় যেটা সম্ভব হত না । এরপরের রঙীন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' কে রঙীন তুলবেন ভেবেছিলেন কিন্তু প্রযোজকের অভাবে তা সম্ভব হয়নি । সীমাবদ্ধে একটি রঙীন বিজ্ঞাপন ছিল শ্যামলেন্দুর কোম্পানীর পিটার ফ্যানের বিজ্ঞাপন । এরপর ১৯৭৩ সালে তিনি তৈরী করেন 'অশনি সংকেত'। চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহারে তার পরিমিতি জ্ঞান এই ছবিতে পাওয়া যায় । তার মতে "এক চরিত্রের সঙ্গে আরেক চরিত্রের শ্রেণীগত পার্থক্য

সাদা-কালোয় যতটা ফোটানো সম্ভব, রঙে সে কাজটা হয় আরো সাহজে, আরো অনেক তীক্ষ্ণভাবে। একটি প্রত্যন্ত গ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা যাচ্ছে সব কিছুর অভাব ঘটছে, ক্রমশঃ সবকিছু নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে কিছুরই অভাব নেই, প্রকৃতি উদার। সত্যজিৎ রায় চিত্রভাষা পাল্টালেন রঙের বিচারে। প্রকৃতিকে অকৃপণ দেখানোর জন্যই চলচিত্রটি তুললেন রঙীন। এরপর বিভিন্ন তাৎপর্যময় হয়ে এসেছে অনেকগুলি রঙীন ছবি। প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা পাই রঙের প্রকৃত ব্যবহার। রঙ সম্বন্ধে আমাদের দর্শকদের পরিষ্কার ধারণা এত কম যে এ বিষয়ে মনোযোগী না হলে গুরুত্ব থাকে না।

এরপরের সিনেমা 'সোনারকেল্লা' (১৯৭৫) সত্যজিৎ রায়ের লেখা গোয়েন্দা কাহিনী। হিচককের ছবির মত ফেলুদা সব জানিয়েই শুরু করেন। তবুও পরিচালকের ইচ্ছানুযায়ী সব দর্শক তার সঙ্গে চলতে শুরু করেন গল্পের নিয়তির দিকে। এখানে দুঃখ, হাসি, ভয়, মজা সব উপস্থিত অথচ কোনটাই মাত্রাতিরিক্ত নয়। কলকাতাকে, কেন্দ্রবিন্দু করে আবার একটি ছবি জনঅরণ্য (১৯৭৫)। নির্মমভাবে সমাজকে উন্মুক্ত করেছেন। সোমনাথ এখানে সমঝোতা করে এগিয়ে চলা একটি চরিত্র। সে প্রতিবাদী নয়। সে দালাল। ১৯৭৬ স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা বালা তৈরী করেছেন। এর পরের ছবি 'শতরঞ্জকে খিলাড়ি' (১৯৭৭) পিরিয়ডের ছবি, ঐতিহাসিক ছবি। জটিল চিত্রনাট্য নির্ভর করে এই ছবি গড়ে উঠেছে। পরিবেশ এবং সময়কালকে সঠিকভাবে ধরা হয়েছে। একটি অলঙ্কারময় চলচ্চিত্র। এই ছবি সমালোচকদের ভেতর হৈ চৈ ফেলেছিল। সময়কে কি উঁচু মানের ফ্রেমে তিনি বন্দী করতে সক্ষম হয়েছেন তা এই ছবির দর্শকমাত্রই উপলব্ধি করেছেন। শিশুদের উপযোগী হালকা ধরনের ছবি 'জয় বাবা ফেলুনাথ' (১৯৭৮)। 'হীরক রাজার দেশে' (১৯৮০), পিকু (১৯৮০)। টেলিভিশনের জন্য প্রেমচাঁদের গল্প নিয়ে তৈরী দুখি চামারকে নিয়ে 'সদগতি' (১৯৮১) তো বাজারে আলোড়ন তুলেছিল এখন যে বিশ্বকাপ বা অলিম্পিক ঘিরে আগে যেমন টেলিভিশন সেট কেনার হিড়িক পড়ত, মনে পড়ে ঠিক তেমনভাবেই ২৫ এপ্রিল ১৯৮২তে যখন 'সদগতি' এবং 'শতরঞ্জকে খিলাড়ী' দেখাবার কথা ঘোষণা করা হল তখন এই শহরে প্রচুর টেলিভিশন সেট বিক্রি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এত টেলিগ্রাম এবং শোকবার্তা আসছে যে বিদেশ সঞ্চার নিগম' জানিয়েছে পূর্বে কোনো এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে এত বার্তা আর কোনদিনও আসেনি। ঠিক তেমনটিই ঘটেছিল 'সদগতি' ছবিটি নিয়ে। কোনো একটি ছবির জন্য টেলিভিশন বিক্রি হওয়াটা একটা নিঃসন্দেহে রের্কড করে রাখবার মত ঘটনা। অনেকেই পুরনো খবর কাগজ খুলে এমন একটি সংবাদ দেখে নিতে পারেন। এর পরের ছবিও নানাদিক থেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ ১৯৮৪তে নির্মিত হল সেই ছবি যা তিনি পথের পাঁচালী না করলে হয়ত করতেন বলে অনেকে ধারণা করে থাকেন। 'ঘরে বাইরে' এবং চারুলতার সাদৃশ্য নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়ে গেছে। আসুন ছবি দুটির সাদৃশ্য এবং অমিল নিয়ে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্য শোনা যাক "মিল আছে শুধু একটা ত্রিকোণের ক্ষেত্রে। অমিল বলতে প্রথমেই বলতে হয় ভূপতি ব্যাপারটা বুঝতে পারল একেবারে শেষে কিন্তু ঘরে বাইরের নিখিলেশ অনেক আগেই সেটা বুঝে গেছিল। চারুলতায় মনে হয় অনেকক্ষণ একটা হালকা রসের ছবি চলছে। অমল ও চারুর মধ্যে ঝগড়াঝাটি চলছে। প্রথমদিকে তো সম্পর্কটা অনেকটা ছেলেমানুষির স্তরেই ছিল। তারপর আস্তে আস্তে অমলের চলে যাওয়ার পর
এবং অমল যখন চলে গেল অমলও বুঝতে পারছে না। যে চারু তাকে কতখানি ভালবাসে। সে যখন বুঝতে পারল তখনই সে পেছিয়ে গেল। তারও পরে একেবারে শেষে ভূপতি ব্যাপারটা বুঝল। এটা প্রধানতঃ চারুরই গল্প। এখানে সেই কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'-র তিনটে চরিত্রই সমান। বিমলা মাঝখানে বলে একটু বেশী ওজন। সন্দীপ ও নিখিলেশ এই দুজনও সমান। সন্দীপের দিক থেকেও মনোভাব না বুঝতে পারার কোনও কারণ ছিল না। অর্থাৎ অমল যেখানে বুঝতে পারেনি, সন্দীপের সেখানে সেরকম কোন সুযোগ ছিল না। সন্দীপ প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে, হয়ত প্রথমদিনই বুঝতে পেরেছিল যে বিমলা মুগ্ধ।" এই 'ঘরে বাইরে' ছবির প্রযোজক এন এফ. ডি সি কিন্তু ঘরে বাইরেকে সবচাইতে বাণিজ্যিক সাফল্যের ছবি বলে চিহ্নিত করেছে। ঘরে বাইরে ফ্রান্স, আমেরিকা, লণ্ডন, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, পর্তুগালে ভাল ব্যবসা করেছে। সবচেয়ে আশার কথা এই যে আমেরিকায় সাধারণতঃ ভারতীয় ছবি মুক্তি পায় এথনিক জনগোষ্ঠীর জন্য। কিন্তু ঘরে বাইরে-র মার্কিণ পরিবেশক ছবিটি প্রদর্শন করেছিলেন মার্কিণ ছবির সার্কিটে। এর একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল এই যে ভারতীয় ছবির জন্য আমেরিকায় চলচ্চিত্রের নতুন সার্কিট খুলে দিয়েছিল ঘরে বাইরে। এরপর তিনি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র করেন সুকুমার রায় (১৯৮৭)।(১৯৮৯) গণশত্রু অসুস্থতার কারণে ইনডোরে শুট্যিং করা ছবি।

একটি ছোট্টশহর চণ্ডীপুরের ডাক্তার অশোক গুপ্ত হঠাৎ আবিষ্কার করলেন মন্দিরের চরণামৃত থেকে বিশেষ একটি রোগ ছড়াচ্ছে। কলকাতার একটি ল্যাবরেটরি থেকে ঐ জল পরীক্ষা করে তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও অশোক গুপ্ত ঐ মন্দিরকে ঘিরে গড়ে ওঠা চক্র নিশীথ এবং ভার্গভদের জব্দ করতে পারেন না। চতুর কৌশলে অশোক গুপ্তকে তারা জনগণের শত্রু বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। যদিও শেষে শিক্ষিত যুবকদের প্রচেষ্টায় অশোক গুপ্ত উৎসাহিত হন এবং নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন এরপরের ছবি সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু চলচ্চিত্রে রূপ দিলেন দীর্ঘ এক যুগ পর। 'শাখা প্রশাখা' (১৯৯০)। আনন্দমোহন মজুমদারের তিন পুত্র প্রবোধ, প্রবীর, প্রতাপ প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত। আনন্দমোহনের ৭০তম জন্মদিন পালনের সময় তার হার্ট অ্যাটাক হয়। পুত্ররা এক এক করে ঘরে ফেরে। তাদের ভেতরের দ্বন্দ্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে ক্রমশঃ। আনন্দমোহনের তিলে তিলে করে গড়া মূল্যবোধের চরম অবমাননা প্রত্যক্ষ করেন। এই ছবি দেখতে দেখতে ইতালিয়ান পরিচালক ফান্সেসকো রোজির থ্রি বাদার্স-এর কথা অনেকের স্মৃতিতে ভেসে উঠবে। সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি গতবছরে তৈরী। তারই সম্পাদিত ছোটদের পত্রিকা সন্দেশ-এ অতিথি গল্পকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র আগন্তুক। সুধীন্দ্রর স্ত্রী অনিলা ৩৫ বছর পূর্বে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া এক মামা মনমোহনের কাছ থেকে একচি চিঠি পান। অনিলা-সুধীন্দ্রর পরিবারে প্রচণ্ড কৌতূহলের এবং চমক উদ্রেক করে তিনি কিছুদিন কাটিয়ে আবার পথে বেড়িয়ে পড়েন। মনমোহনকে শহরে শিক্ষিতের মুখোমুখি হতে হয় যার জ্ঞান বই নির্ভর। মনমোহনের ৩৫ বছরের উপজাতিদের সঙ্গে বাস, শহুরে পণ্ডিত সেনগুপ্তকে (সুধীন্দ্রের বন্ধু) কাহিল করতে বেশী সময় লাগে না। মনমোহন বোলপুরে যান নিজের ভাগের সম্পত্তি

নিতে । অবশেষে যা তিনি সম্পূর্ণটাই অনিলাকে দিয়ে আধুনিক নব্য সঙ্কীর্ণমনা সুধীন্দ্রদের মুখোশ খুলে দিলেন ।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্র এত বহুমাত্রিক যা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করতে যাওয়া মুখার্মি ছাড়া আর কিছুই নয় । যেখানে চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নজর দিয়েই সংযতভাবে, পরিমিতভাবে এবং পরি-শীলিতভাবে এর রূপ দেওয়া হয় সেখানে একটি নিটোল পরিপূর্ণ শিল্পকলা গড়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক । তাই এর শিল্প সুষমা কাহিনীর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তাছাড়া আমরা যখন তার সৃষ্টি ছবি নিয়ে আলোচনা করি তখন ভুলে যাই পরিচালক মানুষটির কথা। তাঁর কল্পনার রূপরেখা তাঁর শিল্পকৌশল সর্বোপরি তার দৃষ্টি-ভঙ্গীর কথা। চলচ্চিত্র মাধ্যমের কথা ভুলে গিয়ে আলোচনা করলে হবে না । দেখা গেছে তার ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ পাওয়া যায় কিন্তু শিল্পগত দিকের কথা কেউ তোলেন না । চলচ্চিত্র সমালোচকদের মধ্যে সরাসরি দু ধরনের সমালোচনা পাওয়া যায়। একদল সত্যজিত রায়ের চলচ্চিত্রকে ভালো বলবেন না। আর একদল প্রশংসার পক্ষপাতী । এই ধরনের সমালোচনায় উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে শিল্পভাবনার কোন আলোচনা পাওয়া যায় না ।

"শুটিং চলার সময় কর্মরত সকলের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব আমার। 'পথের পাঁচালী'র সময় রাসবিহারীর মোড়ে লক্ষীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে লাঞ্চের জন্য মাথাপিছু খাবার আসত আটখানা করে লুচি, ডাল, আলুর দম, বেগুন ভাজা ও একটি মিষ্টি । ফলে মাথাপিছু লাঞ্চের খরচ দাঁড়াত একটাকা। এছাড়া সকালে টিফিনের জন্য সিঙারা ও জিলিপি অথবা খাস্তা কচুরি ও দানাদার এবং সঙ্গে চা বরাদ্দ থাকত । এই টিফিনের খরচ মাথাপিছু চার আনা ছিল । বিকালে চা-বিস্কুট। কিন্তু 'অপরাজিত'-র সময় দুপুরের খাওয়ায় পরিবর্তন করা হল । কার প্রস্তাবে মনে নেই। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় নিজাম থেকে আনা তিনটে মাটন রোল দাম ছ আনা হিসাবে এক টাকা দু আনা এবং একটি দু আনা দামের মিষ্টি সর্বসাকুল্যে এক টাকা চার আনা ▶ মাঝে মধ্যে অবশ্য চিকেন রোলও দেওয়া হত। তাতে পড়ত এক টাকা দশ আনা। সকালেও বিকালে ব্যবস্থা পূর্ববৎ । স্টুডিওতে শুটিং হলে — ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ বা মাংস এবং দই মিষ্টি । দাম ঐ এক টাকা থেকে এক টাকা চার আনার ভেতর ।" লিখেছেন 'অপরাজিত-কথা'য় অনিল চৌধুরী ।

এই প্রতিবেদনের সিংহভাগ পথের পাঁচালীর উপর লিখলাম । আমি সেই কারণের সমর্থনে কিছু বক্তব্য রাখছি । সত্যজিৎ রায় যখন সিনেমা করবেন ভাবলেন এবং সিনেমা করলেন তখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। পৃথিবীর চলচ্চিত্র ভাণ্ডারে ততদিন অনেক মণি মুক্তো জমা পড়েছে । চ্যাপলিনের একের পর এক ছবি সিটি লাইট, গোল্ড রাশ, মর্ডাণ টাইমস ইত্যাদি। ড্রায়ারের 'দ্য প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক'। রেনোয়ার 'রুলস অব দ্য গেম', অরসন ওয়েলসের 'সিটিজেন কেইন' । ভেতর্ফের 'কিনো-আই' । আইজেনস্টাইনের 'জেনারেল লাইন' । পুদোভকিনের 'এণ্ড অব সেন্ট পিটার্স বার্গ' । এদিকে জাপানের কুরোশাওয়া তৈরী করে ফেলেছেন 'দ্য মেন হু ট্রেড অন দ্য টাইগাস টেল' ও 'রশোমন'। এমন বেশ কিছু ছবি তৈরী হয়ে গেছে। বিশ্বের চলচ্চিত্রের মান যখন বেশ সমীহ করবার মত অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তখনও আমাদের নির্দিষ্ট ছক ভাঙেনি । গান এবং অতি নাটকীয়তায় ভরা চিত্রনাট্যই ছিল সেই ছকের পুঁজি । চলচ্চিত্র যে শিল্প মাধ্যম, এর যে জীবনের সাথে আরো বেশী যোগ আছে এই বোধ কি তখনকার কোন চলচ্চিত্র দিতে পেরেছে ? বাস্তবের সঙ্গে যে চলচ্চিত্রের বিশেষ যোগ আছে কোন দর্শক পরিচালক তখন ভাবতে পারেন নি।

আচ্ছা দেখুন তো কোন ছবিতে নীচে বর্ণিত কোন ঘটনার প্রতিফলন পেয়েছেন কি কখনো?

দূর্গা মারা যাবার পর ছবিতে যে দৃশ্যগুলো আছে । তার ভেতর বিখ্যাত দৃশ্যটি হরিহর অনেকদিন পর বাড়ি ফেরে, নাম ধরে ডাকেকিন্তু দূর্গা নেই আর । সর্বজয়ার মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝাতে হবে সে অনড় থাকে। কিন্তু অনড় হলেও একেবারে পাথর তো নয়। সুতরাং এই ডাকটাতে সামান্য একটু প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই হবে। সেইটে দেখাতে গিয়ে সত্যজিৎ রায়ের পরিকল্পনা সর্বজয়া গালে হাত দিয়ে বসে আছে । হরিহরের ডাকে তার পেশী সামান্য ঢিলে হবে । তাতে হাতের শাঁখাটা একটু নেমে যাবে । এই শাঁখা নেমে আসা দেখাতে সাতবার দৃশ্য টেক করতে হয়েছিল।

দূর্গার মৃত্যুর পর হরিহরের বাড়ি আসার দৃশ্যটাতে যখন প্রথম হরিহরকে বাড়ির বাইরে দেখা যায়, তখন সর্বজয়ার আসা পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় সবকিছু স্তব্ধ হয়ে থাকে । হরিহরকে শুধু দেখা যায় বাড়ির চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে চাল পড়ে গেছে, রান্নাঘর ভেঙে গেছে, পাঁচিলের ওপর একটা গাছ পড়ে আছে ইত্যাদি। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই, কোন মুভমেন্ট নেই । সত্যজিৎ বাবু হঠাৎ বললেন 'এইখানে সামান্য একটু মুভমেন্ট রাখা দরকার । জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি গরুটা জাবর কাটে তাহলে স্থির অবস্থাটা একটু ভাঙা যায়; সেদিন শুটিং-এর সকালে গরুটাকে প্রচুর খাইয়ে দেওয়া হল, সময়মতো গরুটা জাবর কাটল ।

প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় প্রসন্ন যখন বেতটা রাখে তখন নির্দেশ ছিল বেতটা যেন নুনের ভেতর সামান্য ঢোকানো থাকে যাতে প্রসন্ন বেতটা তুললে নুনটা ছিটেয়ে পড়ে চারিদিকে ।

এমনই অসংখ্য ছোট ছোট ডিটেলে ভরা একটি চলচ্চিত্র ভারতবর্ষে তৈরী হল । যা আগে হয়নি । নিখুঁত একটি চলচ্চিত্র । যেখান থেকে প্রকৃত চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু । এখানেই তাকে স্রষ্টার সম্মান দেওয়া হয়েছে । তাই সৃষ্টিকে নিয়ে আলোচনায় অধিক কথন নিশ্চয় প্রতিবেদনের সাম্যতা নষ্ট করে না । এই প্রসঙ্গে খুবই সময়োপযোগী হবে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র নির্মাণের পঁচিশ বছর পার হয়ে যাবার পর তার উক্তি অনুসরণ করলে । "পথের পাঁচালি করার পরে এই পঁচিশ বছরে আমি চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে নতুন কি জ্ঞান লাভ করেছি এবং সেটা কিভাবে আমার পরবর্তীকালের ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে, সে কথা অনেকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করেছিল। এই প্রশ্নের পেছনে হয়ত এমনও একটা ইঙ্গিত ছিল । যে পথের পাঁচালির মতো এত খ্যাতি, এত প্রশংসা, এত পুরস্কার যখন আমার আর কোন ছবিই পায়নি তখন চলচ্চিত্রকার হিসেবে সত্যিই কি এই পঁচিশ বছরে আমার কোন উন্নতি হয়েছে ? এর এক কথায় উত্তর হল — অবশ্যই হয়েছে এবং তার প্রমাণ রয়েছে আমার পরের দিকের অনেক ছবিতেই ।"

আজ সত্যজিৎ আর নেই । ভারতবর্ষে সিনেমা জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তিনি । সংস্কৃতির নানা শাখায় তার ছিল অবাধ বিচরণ। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি তিনি সাহিত্যকেও ধনী করেছেন তার ঐশ্বর্য্য দিয়ে । এই স্বল্প পরিসরে এমন উন্নতমানের এক স্রষ্টাকে নিয়ে তার সব প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় ।

বিদেশে সাধারণের কাছে সত্যজিৎ চর্চা

অমর বোস

ইউরোপে যে ভাবে সত্যজিতের সিনেমা বা শিল্পকলা আলোচিত বা আলোড়িত হয়েছে। আমেরিকায় ঠিক ততখানি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আমেরিকায় প্রদর্শিত সত্যজিতের ছবির সংখ্যায়ও তাই সহজেই হাতে গুনে বলা যায়। যদিও আমেরিকায় বেশ কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি ওনার পরিচিত একথা আমরা প্রায় সকলেই জানি। কিন্তু সাধারণের কাছে বা একালের ছবির জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকেদের কাছে ওনার পরিচিতি কতখানি? এই বিষয়ে নিউইয়র্কে থাকাকালীন আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখি।

তখন নিউইয়র্কে আমি ব্যস্ত আমার প্রথম ছবি 'মিশ্ররাগ' বা 'A Symphony'-র চিত্রনাট্য লেখার কাজে। তখন ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি নিউইয়র্কের নিউ স্কুল-এ ফিল্ম নিয়ে পড়াশুনো করছি। ক্লাশের শেষে 12th Streetএবং 5th Avenue-কাছে LA-CAFFE' তে আমরা সবাই আড্ডা মারি। আলোচনার বিষয় অবশ্যই ছবি এবং ছবির জগৎ। এই রকমই একটা আড্ডার শেষে আমার সহপাঠী ও বন্ধু ডোনা উইনার এর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সাবওয়ের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই ডোনা জানতে চাইল আমার নতুন প্রজেক্টের খবর। ও কি করে আমার প্রজেক্টের খবর জানল তা জানতে না চেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বললাম-'চলছে'।

—'বিষয়টা কি একটু বলবে' ডোনা জিজ্ঞেস করল।

—'প্রবাসী বাঙালীদের উপর ছবি করার ইচ্ছা আছে।'

—'চিত্রনাট্যটা একটু দেখাবে' আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র দেখাবার আগ্রহ নেই এড়াবার জন্য বললাম— 'চিত্রনাট্যটা প্রায় সবটাই বাংলায়। তুমি বুঝবে না। শেষ হলে লাইন ধরে বুঝিয়ে বলবো' বুদ্ধিমতি ডোনা বললো— 'প্রায় সবটাই বাংলায়, তাহলে বাংলার বাইরে যেটা সেটা কি ভাষায় লেখা?'

ধরা পড়ে গেলাম, পরদিন দশপাতা ইংলিশ ভার্সান এর একটা কপি নিয়ে এলাম। পড়তে পড়তে ডোনা শেষ পাতায় দেখি আটকে গেল। বারবার পড়তে লাগল। সেই পাতায় চিত্রনাট্যটির যে অংশটি ছিল তা তুলে ধরছি কারণ, আমার মনে হয় পুরো ব্যাপরটাই প্রাসঙ্গিক।

...আমেরিকান মেয়ে লরা তার বাঙালী প্রেমিক আনন্দকে নিয়ে তার বাবার বাড়িতে গেছে এবং ওদের ডিনার টেবিলে কথা হচ্ছে।

Bob[Father]:-When I think of Calcutta couple of things come to my mind: I know a section of people they are very educated and creative oriented ... and next thing is mother Terrasa.

Ananda:-You never heard of Satyajit Ray?

Bob:-No who is he?

Ananda:-I think he is one of the great film maker in the world. He has made 35 plus films. Composes his own music, Writes his own screen play. His very first film, I think, is the longest runing foriegn film record in the New York City.

Bob:-(Suprised): Really (Turn to Loura) How funny I didn't know

Loura:- You should read a book by Andrew Robinson called, 'The Inner Eye' that way you know all the amazing things he has done. The president of France flew all the way to Calcutta. Just to give him the 'Lia-Sion of Honours'. It's a shame that people you know the people like you, don't know about him.

Bob(Jole):- People like me, people like me think, people like me think what I..লরা এবং বব হেসে উঠতে।

Ananda:- What what did I miss here?

Loura:- It's a dilouge from citizen carn; that my father will never forget it. He always miss it in his every day conversation.....

এরপর কেটেগেছে বেশ কয়েকটা দিন। সপ্তাহ দুই পড়ে সেই 'লা কাফেতে'ই একদিন সবাই মিলে আড্ডা মারছি হঠাৎ কথার মাঝখানে ডোনা, ক্যাথিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধ কি জানো?

ক্যাথি —আমি যখন নিউ-ইয়র্কে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন সত্যজিতের পথের পাঁচালী, ছবি দেখিয়ে সেখানে ইংলিশ ড্রামার ক্লাশ নেওয়া হতো। ছবির বিশ্লেষন, প্রশ্ন এবং উত্তর দেওয়া হতো। এবং পরবর্তীকালে আমি চিত্র পরিচালনায় আসবো এই ইচ্ছা মনে থাকায় আমি পথের পাঁচালীর টেপটা বাড়িতেও নিয়ে যাই যাতে ওটা বার বার দেখতে পারি। (আমার দিকে তাকিয়ে ক্যাথি হঠাৎ প্রশ্ন করে) একটা প্রশ্ন করবো। এই চলচ্চিত্রটি করার আগে সত্যজিৎবাবুর নাকি ছবির করার কোন অভিজ্ঞাতাই ছিলনা। এমনকি আমাদের মতো ক্যামেরা ঘাড়ে করে রাস্তাঘাটে কোন পরীক্ষামূলক কাজও উনি করেননি। অথচ এই ছবিটি কত সাধারণ এবং বলিষ্ঠ সত্যিই যদি উনি এর আগে কোন ফিল্ম না করে থাকেনে...

—সত্যি যদি মানে!—ডোনা প্রতিবাদ করে বলে—তুমি কি বলতে চাইছ?

—যদি পথের পাঁচালীর আগে উনি কোন ছবি না করে থাকেন; ক্যাথি, ফান্ড গলায় বলল—তাহলে হি ইজ এ জিনিয়াস।

আমি জানতে চাইলাম, ক্যাথি তুমি ওঁর অন্যকোন ছবি দেখেচ?

ক্যাথি ঘাড় নাড়ল।—তবে তোমার থেকে ওঁর বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

এদিকে ডোনা আড্ডার উপস্থিত আর সকলকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করছে সত্যজিৎ রায়ের কাজ সম্পর্কে আর কে কি জানে।

১২ পাতায় দেখুন

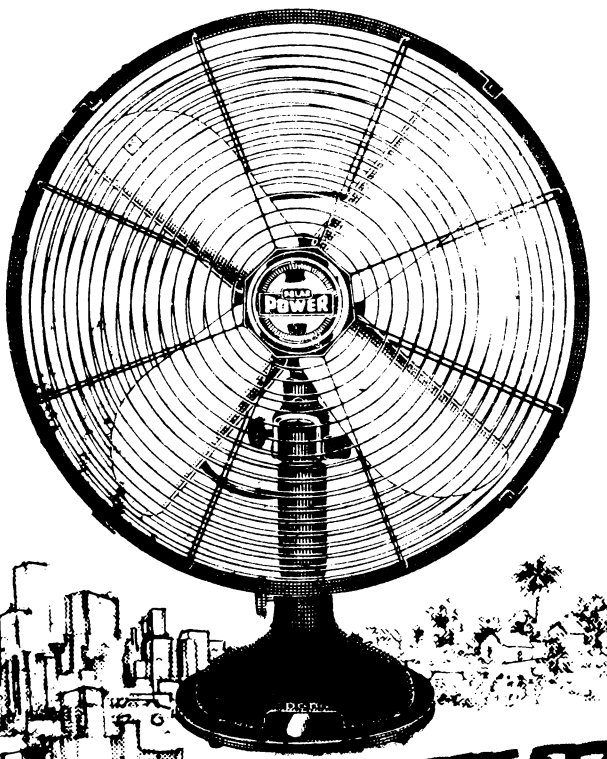

সরাসরি চ্যালেঞ্জ
সিন্নী আর এইরকম
অন্য সব পাখা
হুঁশিয়ার
POLAR
POWER
কালো পাখার জগতে সবার আগে
দুরন্ত হাওয়ার শক্তিতে ভরপুর।
নিঃশব্দ হাওয়ার বিস্তার। দারুণ মজবুত অতুলনীয় গার্ড। আধুনিকতম
ঘূর্ণন প্রযুক্তি। আর বিদ্যুতের খরচও শতকরা পঁচিশ ভাগ কম।
পোলার পাওয়ার
সুপার পাওয়ার
পোলার পাওয়ার
সিন্নী
৬০·৭৫ মিং/মিনিট
৫৩ ওয়াট
৬৯ ওয়াট
এক এবং অদ্বিতীয় !
POLAR
POWER
কালো পাখা

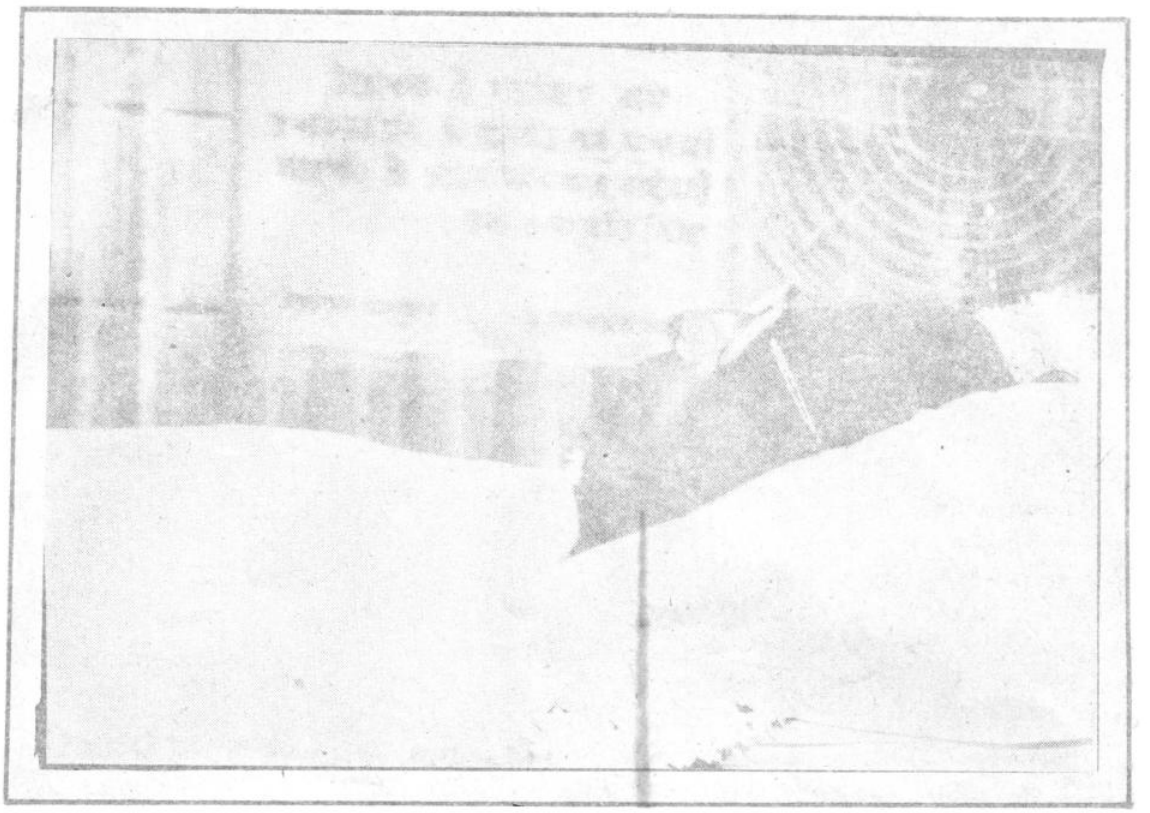

স্মৃতি শ্রদ্ধা

অন্নদাশঙ্কর রায়

অনুলিখন ঃ সমাপ্তি ভট্টাচার্য মৌসুমী বসু

সত্যজিৎ রায়ের সাথে আমাদের পরিচয় ১৯৪০ সাল থেকে। কলাভবনের ছাত্র ছিলেন, আমার স্ত্রীর সাথে ওনার বেশী পরিচয় ছিল। সত্যজিৎ ওকে মাসি বলে ডাকতেন এবং আমার স্ত্রী ও'কে মানিক বলতেন। এই সম্পর্ক অনেকদিন স্থায়ী হয়। সত্যজিৎ ফিল্ম তৈরীর সময় বাংলা স্ক্রিপ্ট-এর ইংরাজী অনুবাদ করতেন লীলা রায়, এবং সত্যজিৎ ইংরাজী থেকে বাংলা করতেন। নতুন সিনেমা তৈরীর সময় উনি ডাকতেন আমরা যেতাম। গুপিগাইন থেকে শাখা প্রশাখা পর্যন্ত তাঁর প্রত্যেকটা ছবি আমরা দেখেছি তাঁর সৌজন্যেই। আমাদের বিবাহের যখন ৬০ বছর পূর্ণ হয় তখন আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবদের নেমন্তন্ন করি, সেখানে সন্ধ্যাবেলা সত্যজিৎ উপস্থিত হন। তাঁকে কিছু মিষ্টি খেতে দেওয়া হয়। তিনি একটা মিষ্টি খেলেন। তাঁর সেই মিষ্টান্ন ভোজনের দৃশ্য টিভি ও তে তুলে রেখেছি। তাঁর ছেলের বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম। উনি আমার ছড়া পড়তেন।

সুকুমার রায়ের ছড়ার পরম অনুরাগী ছিলাম আমি। একদিন সত্যজিৎও লিখতে আরম্ভ করলেন। আমি শুনতে পেলাম ছেলেদের গল্প লিখে সত্যজিৎ ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে। তাঁর একটি গল্পের অনুবাদ করেছিলেন আমার নাতি চন্দ্রনাথ রায়। উপেন্দ্রকিশোর সুকুমার, সত্যজিৎ এই তিন জনকে নিয়ে ছড়া লিখেছিলাম সেটা 'রায়রঙ্গ' নামে সঙ্কলনে ছাপা হয়।

ছেলেবেলায় যখন 'সন্দেশ' বেরোত আমি পড়তাম। সুকুমারের মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' বন্ধ হয়ে যায়। পরে সত্যজিৎ পুণঃ প্রকাশ করেন। সেই সময় থেকে তার সাহিত্য ক্ষমতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সঠিক উপায় তৈরী চলচ্চিত্র গুলোকে বাঁচিয়ে রাখা এবং স্থায়ী করা। তাঁর সিনেমা গুলোর মধ্যে 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী' আমাকে অবাক করে। এরকম সৃষ্টি খুব কম মানুষের পক্ষে সম্ভব। তবে 'পথের পাঁচালী'-র সাহিত্য রসকে সত্যজিৎ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি তাঁর সৃষ্টি দিয়ে।

শানু লাহিড়ী

সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ বহু বছর আগে থেকেই। উনি আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তখন আমাদের রাসবিহারী এ্যাভিনিউর বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন ও'নারা। আমার দুই দাদা, কমলকুমার এবং নীরদমজুমদার, দুজনেরই বন্ধু ছিলেন সত্যজিৎ। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তখন বংশী চন্দ্রগুপ্তও আসতেন। সেসময় সত্যজিৎ পথের পাঁচালী করছেন। কমলদার সঙ্গেই সত্যজিৎবাবুর বেশি আড্ডা হতো। এবং পথের পাঁচালীর ব্যাপারেই। তো এইভাবে সত্যজিৎবাবুকে তখন দেখতাম। তারপর বহুদিন নানা অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে। একদিন আমাকে উনি জানালেন যে ওনার বর্তমান বাড়ির কাছে ফিলিপস-এর আঁকা আমার ছবিগুলো ওনার খুব ভালো লেগেছে। সত্যজিৎ বাবুর শিল্পসত্তা ছড়িয়ে ছিল তার সমস্ত জীবন ভরে। তিনি চলচ্চিত্রে ছবি এঁকেছেন। আমি যখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছি। তখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে —আপনি কি মনে করেন যে একজন শিল্পীর শিল্পের সমস্ত দিকগুলোই জানা দরকার। আমি উত্তর দিয়েছিলাম 'নিশ্চয়ই'। তারা একজনের নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে বলেছিলেন। আমি বলেছিলাম—সে তো আপনাদের চোখের সামনেই রয়েছে সত্যজিৎ রায়।

আমার পায়ের একটা ব্যাথায় আমার হাঁটতে কষ্ট হয় আজকাল তবু সেদিন সত্যজিৎরায়কে দেখতে নন্দনে ছুটে গিয়েছিলাম আমাকে দেখে একজন প্রশ্ন করেছিল আপনি এই অবস্থায় যেতেপারবেন ? আমি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে তাকেবলেছিলাম যে—'যে ভদ্রলোকটি আমার দুই দাদার মৃত্যুতে শ্মশান পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার সে পরম আত্মীয়টিকে আমি ভুলি কি করে ? আমাকে যেতে তো হবেই।'

—

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সত্যজিতের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় আমার ধর্মতলা স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। দীর্ঘকায় তরুণ, কথা প্রসঙ্গে দেখালেন তার নিজের 'ফিল্মগল্পের তালিকা' দেখেই বুঝতে পারি 'এমন সংগ্রহ আমাদের দেশে অতুলনীয়'-সত্যজিৎ অসামান্য। শৈথিল্য বস্তুটি এর ধাতে নেই। সত্যজিতের ছিল প্রখর সমাজ চেতনা। দেখেছি জনস্বার্থের সমর্থনে সমাজপতিদের সমালোচনা।

—

পথের পথিক সেও দেখে যাবে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বংশগত ঐতিহ্য বহন করে সত্যজিৎ রায়ও ছিলেন মূলতঃ শিশু সাহিত্যিক। গল্প বলার এক অসামান্য ভঙ্গী ছিল তাঁর। বাহুল্য বর্জিত, প্রসাদ গুন সম্পন্ন, এবং কৌতূহলে উদ্দীপক এরকম গল্প বলার কৌশল এখন বিরল। তাঁর ফেলুদা ও শঙ্কু এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে 'হিউমার' রঙ্গ রসিকতা, রসবোধ এবং চরিত্র সমাবেশ আমাদের বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। অসামান্য ভূতের গল্প তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক পেয়েছি। তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধি ছিল অনায়াস ও জন্মগত। শুধু মাত্র লিখেই তিনি বিখ্যাত হতে পারতেন। তিনি যখন ছড়া অনুবাদ করেন তখন তার ছন্দ ও কবিতার চাল দেখে অবাক হয়েছি। কারন কবিতা গুলোকে আদৌ অনুবাদ বলেই মনে হয়না। গত দুতিন বছর তার কোথাও সেই প্রত্যাশিত ঔজ্জ্বল্য ছিলনা। সেটা হয়তো শারীরিক কারন, কিন্তু তার আগে যা লিখেছেন তা বহুদিন বাংলা সাহিত্যে রাজত্ব করবে। তার লেখায় নারী চরিত্র নেই বললেই হয়। অরুচিকর বা অশ্লীল কোন প্রসঙ্গের অভাস মাত্র তাঁর লেখায় থাকতো না। কখনো নিষ্ঠুরতার বাড়াবাড়িও দেখিনি। মনি মুক্তোর মত ছড়ানো থাকতো বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক তথ্য ও আরও নানান জিনিস, সত্যজিৎ জাত সাহিত্যিক ছিলেন। আলাদা করে বড়দের জন্য লেখেননি বটে কিন্তু বড়রাও ছিল তাঁর বাঁধা পাঠক পাঠিকা।

—

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সত্যজিৎ-এর সাথে আমার দীর্ঘকালের সম্পর্ক এবং আমরা পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম, যে কোন কাজে আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গী। আমরা একসঙ্গে 'সন্দেশ' পত্রিকা বার করে ছিলাম। সুকুমার রায় মারা যাবার পর 'সন্দেশ' বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের 'সন্দেশ' সম্পর্কে একটা ন্যস্টালজিয়া ছিল। সত্যজিৎ যখন সিনেমা করা শুরু করলেন তখন কথায় কথায় 'সন্দেশ'—কে নতুন ভাবে বার করার কথা উঠল। কিন্তু টাকা কড়ির প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখাদিল। সত্যজিৎ-এর কাছে টাকাকড়ি তখন বিশেষ ছিল না। কিন্তু ও'র উৎসাহ ছিল ভীষণ। আমি তখন বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা বললাম, বিজ্ঞাপন দেখে গ্রাহক আসতে লাগল প্রচুর, এবং তার সাথে টাকাও আসতে লাগল। আমরা তখন 'নিউসিনেমা'—র বিল্ডিংএ অফিস নিলাম 'সন্দেশ'—এর। কাজ শুরু হয়ে গেল। ভোমিকদের প্রেস থেকে 'সন্দেশ' ছাপা হত। এইভাবে 'সন্দেশ' বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি আমাদের কারোর না থাকায় ইনভেস্টমেন্টের কথা ভাবিনি। দারুণ খরচ হতে থাকল। এইভাবে চলতে চলতে আমাদের আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল। তখন বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা কো-অপারেটিভ খোলা হল অর্থ সাহায্যে-র জন্য। তারপরে আমি চলে এলাম। সত্যজিৎ পত্রিকা দেখাশুনা করতেন। সিনেমা-র বাইরে বাড়তি সময়টা উনি কাগজে দিতেন। 'সন্দেশ'-এ আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে নলিনী দাশ ছিলেন। তিনি পত্রিকাটি চালাতে লাগলেন। পরবর্তীকালে এলেন লীলা মজুমদার।

সত্যজিৎ-এর বড় কথা হল মানুষকে ভালবাসা। সারা বিশ্বে নিজস্ব প্রতিভার যে বিকাশ ঘটিয়েছেন তার সবটাই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাঁর ভাবনা, তাঁর সৃষ্টি সবই এই বাংলা বিশেষতঃ কলকাতাকে কেন্দ্র করে। তাঁর বেশীর ভাগ সিনেমা-র পটভূমি এই কলকাতা। এবং ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু মধ্যবিত্ত মানুষ। তিনি কলকাতাকে ভালবাসতেন, তাঁর সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে তাঁর রেখে যাওয়া ভাবনাকে অনুসরণ করা উচিৎ। তিনি তো কিছুই নিয়ে যাননি সবই রেখে গেছেন। শুধুমাত্র পুরস্কারে সৃষ্টির মূল্যায়ন হয়না, স্রষ্টা সত্যজিৎ এখন যা দশ বছর আগেও তাই ছিলেন। স্রষ্টাকে সম্মান জানাতে হলে তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন আবশ্যক।

কানন দেবী

কবে যে ও'র সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই। কিন্তু প্রথম দিন থেকে আজ অব্দি উনি আমার চোখে সম্রাট। চলে গিয়েও ভারতবাসীকে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে বুঝিয়ে গেলেন একজন বড় মাপের মানুষকে কীভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। আমি স্বাস্থ্যের কারণেই সত্যজিৎকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যেতে পারি নি। কিন্তু দূরদর্শনে দেখার বাসনা ছিল। সত্যি বলছি, একবার টিভি-তে ঐ নিথর দেহটিকে দেখে আর তাকাতে পারি নি। আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি ঐ দৃশ্য দেখা। পুরনো সব স্মৃতি ভীষণভাবে পীড়া দিচ্ছিল। কী কষ্ট যে হচ্ছিল তা বোঝাতে পারব না।

আমাদের সকলের চোখের জল দিয়ে সেদিন শ্রদ্ধা জানালাম। উনি যা দিয়ে গেছেন আমাদের জন্য, তার তুলনায় এই হৃদয় নিঙড়ানো দুঃখ কিছুই নয়। ও'র কীর্তির সবকিছু এখনও জানা যায় নি, হয়ত আস্তে আস্তে প্রকাশ পাবে। এটুকু বলতে পারি যে, সত্যজিৎ-এর অজস্র শত্রু ছিল। এবং সেটা উনি জানতেন। কিন্তু অনেক বড় মাপের মানুষ বলে উনি কোনদিনই এটাকে পাত্তা দেননি। আমার আর কিছুই বলার নেই।

বীণা দাশগুপ্ত

সত্যজিতবাবু যে মারা গেছেন এটা ভাবাই যাচ্ছে না। ভাবতেই পারছি না। গত শুক্রবার মানে চব্বিশ তারিখ আমি ছিলাম মেদিনীপুরে। সেখান থেকে ফেরার পথে দেখলাম রাস্তার মাঝে মাঝেই সত্যজিতবাবুর ছবি দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জনগণ। সত্যজিতদা মহাপ্রাণ মহামানব। সবার মতোই আমারও আশা ছিল ও'র নতুন নতুন কীর্তি দেখে যাব যা আমাদের গৌরব। রবীন্দ্রনাথের পর সত্যজিৎ রায়ই বোধহয় বাঙালীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আমার সঙ্গে কখনও সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু যোগাযোগ হয়েছিল ফোনে। আমার কাছে অনেকেই ছবি মানে সিনেমায় অভিনয় করার আমন্ত্রণ নিয়ে আসেন। কিন্তু আমি সবাইকেই ফিরিয়ে দিই। কেননা আমার মনে দীর্ঘদিনের সুপ্ত বাসনা ছিল যে ফিল্মে যদি অভিনয় করতেই হয় তাহলে সত্যজিতবাবুর ছবি দিয়েই শুরু করব। কে ভুলতে পারে পথের পাঁচালীর কথা পথের পাঁচালীর স্রষ্টা তাই আমার ভীষণ ভাবে টানত। তাঁকে মনে হয় আবার অতি নিকট আত্মীয়। হয়তো উনি 'আমার কোন যাত্রাভিনয় দেখেন নি। কিন্তু শুনেছি অন্যের মুখে যে ও'র বাড়ীতে নটী বিনোদিনীর ক্যাসেট টি রয়েছে। হয়তো উনি সেটা শুনেওছেন। আমার মনে হয় ও'র-প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে। কেননা এই জগতকে মানে ফিল্মি জগতকে উনি ভালোবেসেছেন আর সেই ভালবাসাকে আমাদের সবার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। আর কি বলব। কিছু বলতে ভাল লাগছে না। আমি ও'র পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

—০—

সেবাব্রত গুপ্ত

পথের পাঁচালীর সূত্রপাতেই বোঝা গিয়েছিল একটা নতুন কিছু সৃষ্টি হতে চলেছে। এর আগে যা বুঝতে পারা যায়নি। আগে যা হতো তা হচ্ছে প্রকাশিত গল্পের চিত্রানুবাদ, কিন্তু সিনেমা যে একটা স্বতন্ত্র আর্ট মিডিয়াম। সেই অভিজ্ঞতাই হলো পথের পাঁচালীতে। সেখান থেকে শুরু করে তাঁর পর পর কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্রের ধারাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। তাঁর এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন কিছু ছেলে শুরু করে এক্সপেরিমেন্ট। এবং সেদিন থেকে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচিত্রের নবধারার জনক। তাঁর ছবি তৈরীর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি সিনেমাতে গল্প বলেছেন। কিন্তু সেটা বলা হয়েছে সিনেমার শর্তকে মেনে নিয়েই, কাজেই তিনি ক্লাসিক গল্প নিয়ে ছবি করলেও সেটা কখনোই নেহাৎ সাহিত্যের চলচ্চিত্র রূপ হয়ে ওঠে নি। সাহিত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক জিনিষ যার পুরোটাই সিনেমা।

মানুষ সত্যজিৎ রায়কে দূর থেকে মনে হয়েছে রাশভারী, গম্ভীর। কিন্তু যখনই কাছে গেছি, ঘনিষ্ঠ হয়েছি, তখনই বুঝতে পারলাম তার মত নিরহংকারী, আড্ডাবাজ, গল্পপ্রিয়, রসিক মানুষ খুব কমই আছেন।

তাঁর মত একজন যুগান্তকারী চলচ্চিত্র কারকে সঠিক শ্রদ্ধা জানাবার মাত্র দুটিই উপায় আছে বলে আমার মনে হয়। প্রথমতঃ যদি তাঁর পরবর্তী চিত্রকারেরা সৎ চলচ্চিত্র তৈরীর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়তঃ দর্শকেরা যদি সৎ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সাহায্যের মাধ্যমে বাংলা সিনেমাকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারেন।

—০—

জ্যোতির্ময় ঘোষ

বিধান রায় মারা গেছেন। কাতারে কাতারে মানুষ এসে ভেঙে পড়ছেন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। বিশাল জনসমুদ্র। ভেতরে ঢুকতে পারছিলাম না। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল দীর্ঘকায় একটি শরীর—সত্যজিৎ রায়। ভাবলাম, একমাত্র ঐ দীর্ঘদেহী বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির পেছন দিয়েই সহজে ভেতরে ঢোকা যেতে পারে। কথা না হলেও এই প্রথম ঐ বিশাল ব্যক্তিত্বের একেবারে সামনা সামনি হওয়া এবং এখান থেকেই তাঁর প্রতি আমি বেশী মাত্রায় মুগ্ধ হয়ে পড়ি। অন্তরঙ্গভাবে একেবারে কাছাকাছি আসার সুযোগ পাই যখন সেনসর বোর্ডে তাঁর 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটি দেখানো হচ্ছিল।

আমরা যে কালে বাস করছি সেটা সত্যজিতের-ই কাল কেননা তাঁর বিচিত্র কর্মমুখী জীবন, একটু একটু করে খ্যাতির শীর্ষে পদার্পণ এবং পূর্ণ পরিণতি সবকিছুই আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। এজন্য আমি সত্যি-ই গর্বিত। যদিও তাঁর সঙ্গে আলাদা করে সাক্ষাতের কোন তাগিদ অনুভবই করিনি কারণ তিনি ছিলেন আমাদের একেবারে কাছেই। এই কলকাতাতেই আমাদের জীবন যাপনের সঙ্গে গভীর ভাবে মিশে আছেন। এটুকু বলতে পারি তিনি যেভাবে এই কালটিকে আত্মসাৎ করেছেন তাতে আমার মনে হয় এটা সৌভাগ্য এতবড় মানুষটার কর্মকাল আমাদের-ই কর্মকাল অর্থাৎ আমার কাছে তিনি এমন-ই এক ব্যক্তিত্ব যিনি একমাত্র এই গোটা কালটির-ই শিরোনাম হবার যোগ্য।

তাঁর যথার্থ স্থান চলচ্চিত্র নির্মাণে স্বতন্ত্র মাত্রা সংযোজনে। তিনি সাহিত্যিক কিনা এবিষয়ে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সাহিত্যিকেরা দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ব্যাপারটা তিনি মুখ্যত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নিয়েছিলেন তিনি ক্যামেরার ভাষাতেই যে সমস্ত চলচ্চিত্র নির্মান করেছেন তার মধ্য দিয়েই বোঝা যায় তিনি কত বড় জীবনবোধ সম্পন্ন সাহিত্য রসিক ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে, নতুন দৃষ্টি কোন থেকে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত চিত্ররূপ দিয়েছেন। যা তাঁর গভীরতম জীবনবোধ, বাস্তবজ্ঞান এবং উচ্চমানের শিল্পরসেরই পরিচয় দেয়। তাঁর নির্মাণের মধ্যে কোন গিমিক নেই অথচ এমন একটা সুগৃহিনী-পনার পরিচয় পাওয়া যায় যা তাঁকে চলচ্চিত্র নির্মাণের এই জায়গাটিতে পৌঁছে দিয়েছে

একটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মনে রাখা

প্রয়োজন যে, কোন কাহিনী থেকে ছবি নির্মাণের সময় বিশেষ করে ভাষান্তরের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকারের একটা স্বাধীনতা আছে। যেটা সত্যজিৎ রায় বারম্বার-ই বলতেন—আই হ্যাভ টু চেঞ্জ হিয়ার এণ্ড দেয়ার।

শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে নির্মাতার নিজস্ব দর্শনটিকে তুলে ধরার জন্য কাহিনীর কিছু কিছু কাটছাঁট করতেন। চারুলতা যখন রিলিজ হল তখন তা নিয়ে অশোক রুদ্র একটি আক্রমনাত্মক সমালোচনা করেছিলেন। তার জবাব দিতে গিয়ে তিনি মূল গল্পের (নষ্টনীড়) যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা পাকা সাহিত্য সমালোচকেরা যেভাবে করতেন তারচেয়ে দক্ষ, নিপুণ ও গভীরভাবে করেছিলেন। এটাই প্রমান করে শ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বকে তিনি কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

সত্যজিৎ রায় বাস্তব জীবনের এত বেশী কাছাকাছি ছিলেন যার জন্য খুব সাধারণ শ্রেণীর মানুষও তাঁর ছবির মধ্যে নিজেদেরকে বারবার বিভিন্ন রূপে দেখতে পেয়েছে। পথের পাঁচালী থেকেই তিনি জনসাধারণের রুচিবোধ, সংস্কৃতিবোধ ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নততর জীবন শিল্পীবোধে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষ যেভাবে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির অবিকৃত প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর চলচ্চিত্রে, এখানেই সাধারণ মানুষের যথার্থ পাওয়া।

আমার মনে হয় আমরা অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বের সঠিক মূল্যায়ণ আজও করতে পারিনি। পেরেছি শুধু তাঁদের মহাপ্রয়াণ বা জন্মদিনে নানা অনুষ্ঠান ও বিলাসিতা করতে। সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক করনীয়, প্রতিষ্ঠার আগে তিনি কিভাবে শ্রমঘাম ঝরিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, কৈশোর থেকে পথের পাঁচালী পর্যন্ত তাঁর এই প্রস্তুতি পর্বের নিদর্শন ফটোগ্রাফি বা চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রজাত করে রাখা। যা ভাবীকালের চলচ্চিত্র নির্মাতা বা গবেষকদের বিশেষ কাজে লাগবে। সম্ভাবনাময় নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করবার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব হবে অপরিসীম। সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রচর্চা আমাদের সংস্কৃতি চর্চার-ই একটি দিক তেমনি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ চর্চা শুধু আমাদের কাছে সংস্কৃতি চর্চা নয়, সমগ্র জীবন চর্চার-ই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।

—

শুভ্রা মল্লিক

রণেন আয়ন দত্ত

সত্যজিৎ-এর সাথে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয় বিজ্ঞাপন শিল্পে প্রবেশের সময়। ১৯৪৩ সালে উনি ডি, জে, কিমার-এ যোগ দেন। আমি বিজ্ঞাপন জগতে আসি ১৯৫১ সালে এবং জে, ওয়াট টমসন-এ চিফ আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে জয়েন করি। সেই থেকে ওঁর সাথে আমার যোগাযোগ এবং সম্পর্ক তৈরী হয়। তারপর ১৯৫৩ সালে উনি বিজ্ঞাপন জগৎ ছেড়ে ফিল্ম তৈরীর কাজে মনোযোগী হন, আর আমি পুরোপুরি বিজ্ঞাপন জগতে চলে যাই। মানুষ সত্যজিৎকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি তবে যেটুকু দেখেছি তাতে একটা কথাই বলবো যে তিনি যে শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করেছেন তার প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। যে কয়েক বছর বিজ্ঞাপন শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন, সেই সময় তিনি যা অর্জন করেছেন পরবর্তীকালে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত শিল্পীর বোধহয় এটাই বৈশিষ্ট্য। যে কাজেই সে মনোনিবেশ করবে তাতেই সে পারফেকশন আনবে। তাঁর কাজের মধ্যে এত শৃঙ্খলা ছিল যে সিনেমা দেখতে বসে মনে হয় দর্শকদের মনের চাহিদা তিনি পূরণ করেছেন ঠিক দর্শক যা চায় সেইভাবে। এতগুলো গুনের আধার হয়েও সিনেমা তৈরীর ভাবনা তাঁর মধ্যে এসেছিল বোধহয় এইজন্য যে তিনি সমষ্টি মানুষের কথা না ভেবে সামগ্রিক মানুষের কথা ভেবেছিলেন, কারণ সিনেমা হচ্ছে এমন একটা শিল্প যা সব শ্রেণীর মানুষের কাছেই উপভোগ্য। বিজ্ঞাপন জগতে আসার আগে তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন সেখানে ছবি আঁকা শেখেন নন্দলাল বসুর কাছে। সেই ছবি আঁকা পরবর্তীকালে ভিস্যুয়াল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে এক সুস্পষ্ট প্রতিভার নিদর্শন রাখেন। তাঁর ছবি আঁকা, ফটোগ্রাফী, সবকিছুর মধ্যে নিজস্ব স্টাইলকে তুলে ধরেছেন।

তাঁর সিনেমা তৈরীর আর একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ সঙ্গীতের ব্যবহার। ফিল্মে আসার আগে তিনি দীর্ঘদিন সঙ্গীত চর্চা করেন একধারে দেশীয় ও বিদেশী সঙ্গীত। তাঁর ফিল্মে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ইমপ্রোভাইজেশন সত্যিই অনবদ্য এবং অসাধারণ।

সত্যজিৎ রায় এক কথায় একজন নিখুঁত শিল্পী। তাঁর শিল্প সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর সিনেমার মধ্যে দিয়ে সমস্ত মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার স্পর্শ পাওয়া যায়। কাজেই সমস্ত মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার আসন অনেক দিনই তৈরী হয়ে গেছে এবং পরবর্তী কালেও হবে। এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আমাদের তাঁর কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। সাধারণ মানুষের কথা বলতে গেলে বলা যায় অনেক আগেই তাঁর শ্রদ্ধার আসন তাদের মনে তৈরী হয়ে গেছে। কারণ সত্যজিৎ যেসব সিনেমা শুরু থেকে আমাদের উপহার দিয়েছে তার সবগুলোই সমস্ত মানুষের মন ছুঁয়ে যায়। সেই মন নিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে শ্রদ্ধা জানানোই হবে একমাত্র কাজ।

সুকুমার সমাজপতি

সত্যজিতবাবুর কাছাকাছি যাবার সুযোগ আমার কোনদিন হয়নি। তবে ওনার শিল্প-কর্মের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ তো নিশ্চয়ই হয়েছে। খেলোয়াড় ছাড়াও ক্লাসিকাল গানের কিছু চর্চাও আমি করি। তাই একজন গায়কের দৃষ্টিতে আমার মনে হয়, যে সত্যজিত রায়ের শুধু ইংলিশ ক্লাসিকাল মিউজিকই নয়, ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি -ও ছিল। কারণ প্রথম দিকে ওনার চলচ্চিত্রে রবিশঙ্কর বা আলি আকবর সুর দিলেও পরবর্তীকালে উনি নিজেই সে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কারণ উনি মনে করেছিলেন যে চলচ্চিত্রের সব কটি ডিম্যান্ড বোধহয় তাঁরা মিট করতে পারেন নি, যার জন্য উনি নিজে গীতরচনার দিকেও ঝুঁকে পড়েছিলেন। কারণ গুপিগায়েন চলচ্চিত্রের ওই অসাধারণ গানের সিকোয়েন্স আর কারোর পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। একটা ব্যাপারে ওনার উপর আমার প্রাথমিক ক্ষোভ জন্মেছিল। সেটা অরণ্যের দিনরাত্রি দেখার পর। ফুটবলার হিসাবে সমিত ভঞ্জের চরিত্রটা বড় বেশী রুড মনে হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভাবার পর আমি দেখলাম যে না, সত্যিই ফুটবলারদের মধ্যে হঠাৎই এরকম চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। ওনার এই ডিটেলিংটা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার গানের গুরু মানস চক্রবর্তীর বাড়িতে তখন চলছিল একটা গানের আসর। সেই সময়েই ওনার মৃত্যুসংবাদ পাই। প্রচণ্ড শোকাহত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল যেন সবকিছু হারিয়ে গেল। অতি প্রিয়জন বিচ্ছেদ ব্যথার কাতরতা আমাকে গ্রাস করেছিল। আমার মনে হয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন, যে ওনার লেখাগুলি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত, সেটাই বোধহয় ওনার সঠিক মূল্যায়নের সুযোগ্য মাপকাঠি হবে।

—০—

দিলীপ রায়

বলার তো অন্য কিছু নেই। উনি যে ভাষায় চলচিত্র করে বিখ্যাত হয়েছেন, সেই বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা আমরা বাঙালী চলচ্চিত্র জগতের যে সময়টায় উনি প্রবেশ করেছিলেন, সেই সময়টায় দেশের চতুর্দিকে খরা। তার মাঝে ধূ ধূ করা মাঠের মধ্যে উনি ছিলেন এক বটবৃক্ষ যা পরে মহীরুহতে পরিণত হয়। উনি আমাদের ছায়া দিতেন। আশে পাশে একটু জলের ব্যবস্থাও ছিল বোধহয়। তৃষ্ণার্তরা সেখান থেকে তেষ্টা মেটাতেন। এই বটবৃক্ষের ছায়া আজ আর আমাদের মাথার উপর নেই। আমার একটা সুপ্ত বাসনা তো নিশ্চয়ই ছিল অভিনেতা হিসাবে যে ওনার ছবিতে অভিনয় করি। এ তো পৃথিবীর যেকোন অভিনেতারই ইচ্ছা বোধহয়। সেকথা কি করে অস্বীকার করি? তবে মানুষ সত্যজিৎ রায়কে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে কাছ থেকে, তাঁর সারল্য, তাঁর রসবোধ আমাকে বারবার মুগ্ধ করেছে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমার পরিচালিত অমৃতকুম্ভের সন্ধানে দেখবার পর (প্রিমিয়ার শো-তে) উনি আমায় হঠাৎ ডেকে বললেন, তুমি তোমার ক্যামেরাম্যানটিকে নিয়ে কাল সকালে একবার আমার বাড়িতে এস। পরের দিন ওনার বাড়ি গেলাম। উনি সাদর অভ্যর্থনার পর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি ঐ ট্রেনের সিকোয়েন্সটি কি করে করেছ আমার জানা দরকার। তোমার বৌদির ও ঐ সিনটি ভীষণ পছন্দ হয়েছে। ওই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে আমি যেন বিদেশী ছবি দেখছি। আমি তখন বললাম আমি উৎসটা আপনার নায়ক ছবি থেকেই পেয়েছি। কিন্তু উনি আমায় অবাক করে জানালেন যে ওই সিনেমায় অধিকাংশ স্যুটিং ইনডোরে করা। আমি বললাম যে আমাদের একটুও মনে হয় না যে এটি ইনডোরে তোলা। এরপর আমার বইটি নিয়ে অনেক কথা হয়। আমার আজকে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে ওঁর সৃষ্টিতে কিছু ত্রুটি আছে বলেই উনি মানুষ। যেটা উনি নিজেই স্বীকার করেছেন। আর তাই মানুষ সত্যজিৎই দেবতা সত্যজিতের থেকে অনেক বেশী সত্য। আমাদের সবার প্রিয় মানিকদা। আমাদের উচিৎ তাঁর সৃষ্ট কাজকে অনুসরণ করা।

—০—

গোপাল হালদার

সত্যজিৎ শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতে একটি অনন্য সাধারণ বিরল প্রতিভা। তার সঙ্গে কবে কখন কোথায় দেখা হয়েছিল এখনও মনে-পড়ছে না। তবে পারিবারিক বন্ধুত্বের সূত্রে ওকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলাম। পথের পাঁচালী যে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেন তার স্ত্রী বিজয়ার অবদান সেখানে অনস্বীকার্য। চিত্রকলা সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান।

সত্যজিতের সিনেমায় বাস্তব গভীর স্পর্শ, মনস্তাত্ত্বিক আবেদন, এবং অপূর্ব সুরের সমারোহে ব্যাপৃত।

সত্যজিৎ সমাজের মূল্যবোধহীনতার কঠিন বাস্তব ভূমিটি, চিন্তাভাবনার অবয়বগুলি প্রতিফলিত করেছেন চলচ্চিত্রে। সত্যজিৎ সহৃদয়। মানবদরদী বাস্তববাদী এবং যুক্তিবাদী ছিলেন।

'পথের পাঁচালী'র সাফল্যের পর প্রথম যখন সম্বর্ধনা সিনেট হলে দেওয়া হয়েছিল তখন সেই সভার সভাপতিত্ব করি আমি। এটা আমার কাছে গৌরব।

—

অমল দে

সত্যজিৎ রায় আমার দীর্ঘ ৩০ বছরের বন্ধু। আমার সাথে গত সেপ্টম্বর মাসে তাঁর শেষ দেখা হয়। আমি নিজেও অসুস্থ। যখন ও'র বাড়ীতে গেলাম আমাকে দেখে বললেন—একি, তোমার শরীর দেখছি খুব খারাপ হয়ে গেছে। তিনি নিজেও তখন খুবই অসুস্থ অথচ সেদিকে কোন নজর দিতে চাননা, আমি বললাম— 'আপনার শরীরও তো দেখছি খুব খারাপ।' বলাতে একটু চুপ করে করে বললেন—'হ্যাঁ আমার স্বাস্থ্যটাও খুব ভেঙ্গে পড়েছে গো।' জানো আমার মত মানুষ রাত ৯টায় ঘুমিয়ে পড়ছে। সারাদিন একজন নার্স আমার দেখাশুনা করছে। ও সময় সময় আমাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে, খাবার খাওয়াচ্ছে এমনকি স্নান করার জলটা পর্যন্ত মাথায় ঢেলে দিচ্ছে। উনি বার বার যে কথাটা বলছিলেন সেটা তাঁর কাজ না করতে পারার দুঃখ।

কর্মযোগী মানুষের কাছে কাজ করতে পারার চেয়ে কষ্ট বোধহয় আর কিছুতে নেই। তাই শারীরিক অসুস্থতার সাথে এই মানসিক কষ্ট তাকে এমনভাবে আঘাত করেছিল যে সেটাই তাকে মৃত্যু এনে দিল। সেদিন ওর কথাগুলো শুনতে আমার এত খারাপ লেগেছিল আর তারপর ওর মৃত্যু সংবাদে আমি ভীষণ মর্মাহত।

সত্যজিৎ-এর অনেক গুনের মধ্যে একটা বিশেষ গুন ছিল তার অসাধারণ গল্প বলা। আমার মনে পড়েছে 'সদগতি'-র গল্প বলতে গিয়ে শেষ দিনটা ওর গলা চোকড্ হয়ে এসেছিল। ১৯৮১ সালে হীরক রাজার দেশে রিলিজ হওয়ার পর গেছি তার কাছে তখন দেখি তার স্পণ্ডেলাইটিস হয়েছে গলায় কলার দেওয়া আমি বললাম—হীরক রাজার দেশে-র সম্বন্ধে কিছু বলবো। বললাম আপনার ছবি হলে দেখতাম এরকম মজা যখন ঘরে বসে দেখছি তখন অন্য মজা। মিউজিক ইন পিকচারাইজেশন তিনি এই প্রথম করলেন। আর বিলম্ব নয়—তে কেটেল গ্রাউণ্ডটা বাজানো, নাহিযন্ত্র নাহিযন্ত্র' গানে ওয়েস্টার্ন টিউন দিয়ে আরম্ভ করলেন। কিন্তু মাঝখানে কি করলেন? উনি কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে বললেন স্রেফ খ্যামটা বুঝলে। মিউজিকের প্রসঙ্গে বলতে গেলে 'সমাপ্তি'তে যখন মৃন্ময়ী ফুলশয্যার রাতে শ্বশুর বাড়ী থেকে পালিয়ে রথতলার দিকে যাচ্ছে, জোৎস্না রাত-তখন ওয়ালজ্ বাজালেন কিন্তু পরেই আবার 'দোতারা' দিয়ে পাল্টিং করলেন। এইভাবে তিনি মিউজিকের পাল্টিং করতেন। তিনি ছিলেন মিউজিকের অথরিটি। বলতেন রবীশঙ্কর বড় গাইয়ে। আমাকে একদিন বললেন—'জানো তো রবীশঙ্করকে চিঠি ছাড়লাম যে 'সেতারে ওয়াল্ড' ফেমাস্ হয়েছো এবার সেতার ছেড়ে সঙ্গীতে এস।' উনি প্রথম দিনের আলাপে আমাকে 'মহানগর'-এর স্ক্রিপট্ দিয়েছিলেন। একদিন বললাম গানের বই দেখাতে—উনি নাইন্টিন সেঞ্চুরীর সমস্ত গানের বই দেখালেন আমায়।

এইভাবে সত্যজিৎ-এর সাথে আমি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলাম নানা সুখ দুঃখ নিয়ে। অনেক ব্যক্তিগত কথা আমাকে বলতেন। আজ খুব মনে পড়ছে সেই সব দিনগুলো।

অমর পাল

সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ অতর্কিতে। অনুপ (ঘোষাল) একদিন এসে বলল সত্যজিৎ আমাকে ডেকেছে। বুঝলাম, নিশ্চয়ই কাজ আছে। তাই একদিন অনুপের সঙ্গে ও'র বাড়িতে গেলাম। এর আগে অবশ্য ও'কে দেখি নি সামনাসামনি। ঘরে ঢুকে দেখলাম লিখছেন। দেখেই বললেন, 'ছবিতে একটা গান গাইতে হবে'। কথাটা শুনেই এক রোমাঞ্চকর আনন্দে সারা মনকে গ্রাস করল। নিজেই বললেন 'একটা গান শুনব'। ভাবছিলাম নিজেই গান শোনানোর কথা বলব। তা উনি বলাতে সংকোচ কেটে গেল। শোনালাম একটা ভাটিয়ালি। গান শেষ হতে বললেন 'গান তৈরী করে খবর পাঠাব'।

খবর পেয়ে দেখা করলাম। দরজা খুলে আমন্ত্রণ জানিয়ে অর্গ্যানের সামনে গিয়ে বললেন। তার আগে হাতে দিলেন গানটি ও তার স্বরলিপি। নিজে বার তিনেক গেয়ে আমাকে গানটা উঠিয়ে দিলেন। বললেন 'ঠিক আছে'। আমি তো অবাক। কিন্তু গানটা কবে করতে হবে? আর শুনবেন না উনি। 'কিছু দরকার হবে না'। তবুও বললাম, আমি আবার আসব? 'পরে একবার ফোন করে আসবেন'। সেদিনও শুনে বললেন, 'ঠিক আছে'। রেকর্ডিং ডেট ঠিক হলে খবর দেব। পরে খবর পেয়ে গেলাম এইচ-এম-ভি স্টুডিওতে। রেকর্ডিং-এর আগে ঘরের বাইরে একবার-দুবার দেখিয়ে দিলেন হারমোনিয়ামে। ঘরে ঢুকে গাইলাম। একটা মনিটর, তারপরে একটা টেক। তারপরেই বললেন 'ওকে'। নিজের মনেই সন্দেহ হলো, ভয় হলো, সত্যিই ভালো গাইলাম তো। সব ভয় চলে গেল বৌদি যেই এসে বললেন 'খুব ভালো হয়েছে'। আজ ভাবি ও'র সত্যিই দূরদৃষ্টি ছিল। নাহলে আমার মতো লোককে কী করে বাছলেন 'হীরক রাজার দেশ'-এর ঐ গানের জন্য, মনে হয় উনি আসলে মানুষ নন, ভগবানেরই মানুষরূপ।

ছবি রিলিজ করার পর জানিয়ে এসেছিলাম আমার শ্রদ্ধা। আমি ধন্য। এই ছবির মাধ্যমে আপনি আমাকে জনগণের কাছে পরিচিত করিয়েছেন।

আমার ঠাকুমা বলতেন, কাশী গয়া বিন্দাবনে গিয়ে কি হবে, ঘরে বসেই সব পাবে। তাই সত্যজিৎ মারা যাওয়ায় গাইলাম দূরদর্শনে—'হায়রে পথের পরিচয়, ভেবে দেখ এসংসারে কেহ কারো নয়'। শেষ শ্রদ্ধা সেদিন জানালাম সঙ্গীতের মাধ্যমেই। কিছুদিন আগে স্ত্রী মারা যাওয়ার দুঃখ পেয়েছি, আবার আঘাত পেলাম। এবার চলে গেলেন সত্যজিৎ রায়।

—

লিলি দাস

সুকুমার রায়ের লেখা নিয়ে সত্যজিৎ রায় অনেক ছবি এঁকেছেন সত্যজিতের ভাষায় ধার করে বলা যায় সমান জীবন্ত ও সমান বিশ্বসাযোগ্য। গ্রন্থচিত্রণের এক নতুন প্রজন্ম তিনি সৃষ্টি করেছেন। গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবে বিজ্ঞাপন সংস্থায় তিনি কাজ করেছিলেন ১৯৪৩ সালে আর চলচ্চিত্র নির্মাণ আরম্ভ করেন ১৯৫৩ সাল থেকে।

সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষার্থীরূপে ছিলেন তৎকালীন নন্দলালবসুর কাছে। এখানে দু'বছরের পর একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় তিনি কাজ করেন এখানেই তার প্রতিভার অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়।

নিশীথরঞ্জন রায়

মানুষ সত্যজিৎ আর শিল্পী সত্যজিৎকে আমার পক্ষে আলদা করা মুশ্‌কিল। কারণ সেই মানুষটির মধ্যে শিল্প সত্ত্বা এমন ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে ছিল যে তিনি সব কিছুই শিল্পের চোখে দেখেছেন। সাধারণ চোখে যা যা দেখা যায় না তাকেই তিনি তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটিই তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা এ'র জন্য তাঁকে বাইরে যেতে হয়নি বা অতীত যুগকেও খুঁজতে হয়নি। প্রকৃত, শহর-গ্রাম সবকিছুই তাঁর 'চিত্র-সাহিত্যে' প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ সত্যজিতের একটা ঘটনা বলি। তখন আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর। তো শতরঞ্জ কি খিলাড়ী চলচ্চিত্র করার সময় তিনি খুব আসতেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। একদিন তিনি এসে গ্যালারীতে ঘুরছেন ও নিজে হাতে স্কেচ্ করছেন। নবাবের মাথায় মুকুটের ছবি। ফটোগ্রাফার ছবি তুলে নিয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি নিজে ছবি আঁকতেন। তাঁর এই ডিটেলিংটাই আমায় মুগ্ধ করেছিল। যা বলছিলাম, সেই সময় আমাদের ওখানে এক ভদ্রলোক দুটো বিরাট ওয়েল পেন্টিং রেখে দিয়েছিলেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। ছবি দুটো ১৭৭১-৭২ সালের নবাব সুজাউদ্দৌলার। এক ইংরেজ পেইন্টার এর আঁকা। তো সত্যজিৎবাবু সেই ছবি দুটো দেখে ভীষণ খুশি হন এবং বললেন যে এই ছবি দুটি না দেখলে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ থাকতো কথায় কথায় তিনি জানতে পারলেন যে ছবি দুটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিজস্ব নয়। পরে একদিন হঠাৎ অবাক হয়ে গেলাম। যখন দেখলাম ছবি দুটির মালিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে ছবি দুটি দান করলেন। পরে জানতে পারি যে স্বয়ং সত্যজিৎ নাকি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ করে ওই ছবিদুটির মালিককে অনুরোধ করেন ছবি দুটি দান করতে। এই ধরনের মানুষ ছিলেন তিনি। আর সত্যজিতের সঠিক মূল্যায়নের কথা বলতে সে সময় তো এখনো আসেনি। তার অনেক দেরী রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মারা যাবার পর এখনো আমরা তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারিনি। সত্যজিৎ তো দূরের ব্যাপার।

ভি ভালসারা

আমি ওনার থেকে অনেক দূরে ছিলাম। আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে ভীষণ ভালবাসতেন। আমার সৌভাগ্য, আমি ওনার সাথে দুটি ছবিতে কাজ করেছি—তার মধ্যে বিশেষভাবে মনে করছে জলসাঘর-এর কথা। ওনার যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী আমাকে টানতো—সেটা হচ্ছে ওনার ডিটেলিং-এর কাজ। সত্যজিৎ রায়-এর সব জিনিসের আমি ভক্ত। তাঁর নিজস্বতা তাঁর কাজ করার ক্ষমতা। ওনার মৃত্যুটা খুবই আকস্মিক। আমার মনে হয় ওনার সঠিক মূল্যায়ন করা হবে যদি ওনার কম্পোজিসন বিশেষ করে সঙ্গীত-এর কম্পোজিসনগুলো যদি সংরক্ষণ করা যায়, এবং সমস্ত চলচ্চিত্রের টাইটেল মিউজিক গুলোকে নিয়ে অ্যালবাম প্রকাশ করা যায়। কারণ উনি ওনার ছবির টোটাল থিম টাকে টাইথেল মিউজিক-এর মধ্যে রাখতেন।

—০—

অমিতা দত্ত

নিশ্চয় সত্যজিত রায় আমাদের দেশের গৌরব। আসলে অনেক ছোট বেলায় পুরীতে গেছি তখন সত্যজিত রায়-এর সাথে আলাপ। ওনারাও সেখানে ছিলেন। পরে বড় হওয়ার পর তার সাথে দেখা হয়েছিল। তখন আমি নৃত্য শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

একটা নেমন্তন্ন বাড়ীতে গেছি সেখানে উনিও গেছেন, আমাকে দেখেই আনন্দিত হলেন। আমার নাচ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমার গুরু বিরজু মহারাজ সম্বন্ধে ও অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। উনি এক-জন ইউনিভার্সাল জিনিয়াস'। আমার একটা কথা এখনো বলার আছে আমরা গর্বিত সত্যজিৎ রায় বাঙালী বলে। বাঙালীর মধ্যে থেকেই রবীন্দ্রনাথ বেরিয়েছে সত্যজিত রায় বেরিয়েছেন। বাঙালীর মধ্যে আরও প্রতিভা আছে। আমরা এ'দের অহেতুক দেবতার পর্যায় না নিয়ে গিয়ে এ'দের কাজের সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারি তাহলে আরও প্রতিভা বেরোতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—আমি মানুষ হয়ে থাকতে চাই। আমার মনে হয় সত্যজিত রায়ও তাই চেয়েছিলেন। আমরা তাকে দেবতার পর্যায় উন্নীত করে বোধহয় তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি।

—০—

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

ব্যক্তি সত্যজিৎ রায় ছিলেন মহান। যেমন উচ্চ মাপের মানুষ ছিলেন, তেমনি উচ্চ মনেরও মানুষ ছিলেন তিনি। আমার অভিনীত 'বাইশে শ্রাবণ' ছবিটি তখন সবে রিলিজ করেছে। সেই সময় একদিন ১৯৬২ সাল নাগাদ এলিট সিনেমায় গেছি। সেখানে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রদোষ বিজয় চট্টোপাধ্যায় এবং স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। সেদিন কিছু কথা হয়েছিল, ঠিক তার পরেই সত্যজিৎ রায় ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে। বললেন তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'অভিযান' লেখাটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন। এবং আমাকে সেখানে একটা ইম্‌পর্টান্ট রোল করতে হবে। ওনার সাথে কাজ করতে গিয়ে যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি হন্ট্ করেছে সেটা হলো অভিনেতাদের প্রতি ওনার উদারতা। যেমন উনি সবসময় কোন শট্ টেক করা হলেই বলে উঠতেন কাট্-ফাইন।

তারপর এসে বলতেন, 'শটটা আমি আর একবার টেক করতে চাই।' পরের টেকে বলতেন এক্সেলেন্ট। এইভাবে উনি কোন শট পছন্দ না হলে সেটা কখনোই মুখের ওপর খারাপ হয়েছে বলতেন না। অভিনেতা টেম্পারামেন্টকে কখনো নষ্ট হতে দিতেন না। তো আমরা পরে বুঝেই যেতাম যে কোনটা ওনার ভালো লেগেছে, কোনটা লাগেনি এই সব। আসলে অভিনেতাদের হতাশ না করে কিভাবে কাজ করিয়ে নিতে হয় সেটা উনি খুব ভালোভাবে বুঝতেন। আমার সঙ্গে ও'র শেষ দেখা ও'র ছেলে সন্দীপের বিয়েতে। তারপর এই খবর আমাকে নিথর করে দিয়েছে। আমার আর বলার মতো কিছু নেই। আমি এমন একজন মানুষকে হারালাম যিনি ছিলেন আমার পরম আত্মীয়ের মতো।

তাপস সেন

সত্যজিৎ রায়কে বহুকাল ধরেই চিনতাম। সে আজকের কথা নয়। উনি যখন ছবি তৈরী করতে শুরু করেননি তখন থেকেই ওকে চিন তাম। মানে পথের পাঁচালীর আগে থেকেই। বংশী চন্দ্রগুপ্ত আমাদের সঙ্গে ছিল, ওর মাধ্যমেই যোগাযোগ। সত্যজিৎবাবুর চলচ্চিত্রে আলোর ব্যবহার এককথায় অকল্পনীয়। ক্যামেরায় পেয়েছিলেন সুব্রত মিত্রকে আর ছিলেন বংশী-চন্দ্র গুপ্ত তাই হয়তো পথের পাঁচালী হয়েছিল একটি অসাধারণ ছবি। 'আগন্তুক' শ্যুটিং এর আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর বাড়িতে।

ওঁর আমার অনেক নাটক, অনেক বলি কেন প্রায় প্রত্যেকটিই দেখেছেন এবং বলেছেন ভাল লেগেছে। মিনার্ভায় যখন তিতাস একটি নদীর নাম চলছি তখন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেই সমস্যা উনিই দাঁড়িয়ে থেকে মিটিয়েছিলেন। এখন মনে পড়ছে সেই সব দিনের কথা যখন আনন্দবাজারে 'কল্লোল' এর বিজ্ঞাপণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। উনি তার বিরুদ্ধে আমাদের সাথী হয়েছিলেন। আরো মনে পরছে তখন উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হলেন। সেই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদেও উনি ছিলেন আমাদের সবার সঙ্গে। শুধু তাই বা বলি কেন। নাটক নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধেও আমাদের সঙ্গে সোচ্চার হয়েছিলেন। বম্বেতে থাকাকালীন বিবিসির খবরে শুনলাম ওঁর মৃত্যুসংবাদ। তাই ওঁকে আর শেষ দেখা দেখতে পেলাম না। বংশী মারা যেতে উনি বলেছিলেন 'বংশীর এ মৃতদেহ আর দেখতে ইচ্ছে করছে না। আমারও সেই একই ফিলিংস। ওঁকে এত কাছ থেকে এত আপন করে দেখেছি যে ঐ মৃতদেহ না দেখার ক্ষোভ আর আদৌ নেই। ওঁর সেই চিরতরুণ শাল-প্রাংশু দেহটাই আমার স্মরণে চিরকাল থাকুক। ওঁর এই মহাপ্রয়ান সবাইকে যেভাবে ব্যথিত করেছে আমাকেও সেইভাবে নাড়া দিয়েছে। ষ্ট্যাচু বা রাস্তা করে নয়, ওঁর প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা সেভাবেই জানানো সম্ভব যদি সত্যিই ওঁর ঐ ফিল্ম আর্কাইভিটি গড়ে তোলা যায়।

—০—

চিন্ময় রায়

মানিকদা অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই সর্বদা চিন্তায় ছিলাম। প্রতিদিন সকালে কাগজ খুলেই দেখতাম স্পেশাল বুলেটিন-এ কি দিল। খুবই টেনশনে কাটছিল দিনগুলো। তারপর তো আমাদের সবাইকে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেলেন। ঐদিন, মানে ২৩শে আমি ছিলাম শিলিগুড়িতে, ইন্দর সেনের পরবর্তী ছবির আউটডোর শ্যুটিং-এ ওখানে ছিলেন রবি ঘোষ অনুপকুমারও। যখন খবরটা আমরা পেলাম তখন একটি মজার দৃশ্যে হেসে খেলে ক্যারাটের সঙ্গে গান গাইতে শিখছিলাম। দারুণ মজার সিকোয়েন্স। ঠিক সেই সময়েই সংবাদটা এলো। আমরা সবাই মুহূর্তের মধ্যে ফ্রিজ হয়ে গেলাম। সবাই একমত হয়ে শ্যুটিং বন্ধ করে দিলাম। এবং ওইখানেই একটি ছোট শোকসভা করা হলো। আমরা জানতাম শ্যুটিং বন্ধের এই সিদ্ধান্ত প্রযোজক মেনে নেবেন, কেননা মানিকদা তো এক কথায় ভারতীয় চিত্রজগতের নবযুগের প্রবর্তক। সুতরাং তার প্রতি এই শ্রদ্ধটুকু জানানো আমাদের কর্তব্য। ওখান থেকে ফেরার টিকিট আমার ছিল ট্রেনের। তাই সময়মতো এসে পৌঁছতে পারলাম না। শেষ দেখা দেখতে পেলাম না।

উনি তো শুধু ভারতরত্ন নয়, পৃথিবীরত্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যিই এতবড় প্রতিভা জন্মায় নি। প্রথম সম্মান উনিই পেয়েছিলেন ফরাসীদের কাছ থেকে। ফরাসীরা ভালো কিছু না পেলে প্রশংসা করে না। পথের পাঁচালী দেখে ওরা মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই পুরস্কার দিয়েছিলেন। অনেকে বলেন, প্রাইজ না পেলে আমরা সত্যজিত রায়কে পেতাম না। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ভালো কোনো কিছুই চাপা থাকে না। হয়তো মূল্যায়ন হতে কিছুদিন সময় লাগত, কিন্তু হতোই। আমি ওর দুটি ছবিতে অভিনয় করেছি—গুপী-বাবা ও চিড়িয়াখানা। গুপী গাইনের সময় জয়শলমীর-এ কুড়ি দিন একসঙ্গে ছিলাম। সেসব দিনের কথা মনে পড়ছে। চিড়িয়াখানা-র পানুগোপালের মতো চরিত্রে অভিনয় কি করে করতে হবে তা উনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। ওতে আমার একটুও কৃতিত্ব নেই। উনি যা দেখিয়েছেন, তাই করেছি। বুঝেছিলাম তখনই যে উনি কত বড় মাপের অভিনেতাও। শুভেন্দুর (চট্টোপাধ্যায়) বাবা একটি মূক ও বধির স্কুলে পড়াতেন তা আমার ওই পানুগোপাল চরিত্রটি দেখে বলেছিলেন, ছেলেটি কি সত্যিই বোবা। এ কৃতিত্ব পুরোটাই মানিকদার।

বড় বড় চিত্র পরিচালকরা কেউই বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না। কিন্তু মানিকদা করলেন গুপী গাইন বাঘা বাইন। এবং আমরা পেলাম না মিউজিক্যাল ফ্যানটাসি। এ ধরণের ছবি আর কেউ তো আমাদের দিতে পারলেন না। এবং এই ছবি থেকেই আমরা পেলাম সুরকার-গীতিকার সত্যজিৎ-কে এও এক মস্ত পাওয়া।

আমার মনে হয় ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঠিক পথ ওঁর চলচ্চিত্র বারবার দেখে তা থেকে শেখা। শিখে নেওয়া ফিল্ম ট্রিটমেন্ট কি ফিল্ম ল্যাংগুয়েজই বা কি। শিখতে হবে কিভাবে সেলুলয়েডের মাধ্যমে গল্প বলতে হয়। একজন শিল্পী যেমন বোঝেন তার ক্যানভাসে কোথায় সবুজ, কোথায় মেরুন, কোথাইবা লাল দিতে হবে বা সেটা কতটা চড়া বা হাল্কা হবে, তেমনি মানিকদাও বুঝতেন, এবং খুব ভালো-ভাবেই। ফিল্ম তৈরীর আগে যেভাবে উনি স্কেচ করে কস্ট্যুম থেকে চেহারার আদল পর্যন্ত তৈরী করে রাখতেন, তা সত্যিই শিক্ষনীয়। তরুণ পরিচালকদের উচিত মানিকদার এই কর্মধারাকে সঠিকভাবে ফলো করে ওই পথ ধরে এগুনো। কেননা নবীন চিত্রপরিচালকদের মধ্যেই তো বেঁচে থাকবেন সত্যজিৎ রায়।

—০—

সন্ধ্যা রায়

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিবারের পরিচয় অনেকদিনের। উনি ফিল্ম তৈরী করতে শুরু করার আগে থেকেই। ওঁর বাড়ীতে আমাদের যাতায়াত ছিল। 'অপুর সংসার'-এ উনি ঠিক করেছিলেন আমাকে নেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাস্টিং থেকে আমি বাদ যাই, যার সঠিক কারণ জানি না তবে সেই থেকে আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা হয়। তারপরে তো অনেক ছবিতেই যখন আমি নায়িকার কাজ করছি, তখন উনি 'অশনি সংকেত'-এ অভিনয় করতে আমাকে ডাকলেন। চরিত্রটি অবশ্য সেকেণ্ড লিড। কিন্তু তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই। কেননা ঐ পার্শ্বচরিত্রে কাজ করেই আমি যে সম্মান পেয়েছি, তাতেই আমি ধন্য। এদেশে অবশ্য সর্বদাই হিরো-হিরোইনকে নিয়ে মাতামাতি হয়। কিন্তু বিদেশে সবসময়ই অভিনয়গুণকে বিচার করা হয়। এবং সেই মাপকাঠিতে নায়ক-নায়িকা থেকে শুরু করে পার্শ্বচরিত্রদেরও একই আসনে বসিয়ে বিচার করা হয়। আর তাই সকলের প্রশংসা পেয়ে আমি গর্বিত, এবং এর জন্য আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা হলো নন্দন-এ, 'আগন্তুক'-এর প্রিভিউ দেখতে এসে। উনিই আমাকে ফোন করে আসতে বলেছিলেন। সেদিন ওঁর পাশে বসেছিলাম পুরোটাই। সেই স্মৃতি এখনও হন্ট করছে। আর তারপরে ঐ শালপ্রাংশু দীর্ঘদেহী ব্যক্তিত্বকে 'নন্দন'-এ শায়িত অবস্থায় দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তিনি তো আর কম বড় মাপের মানুষ নন। বাংলা তথা বাঙালী জাতির, তাই বা বলি কেন, উনি সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব এবং এমন ব্যক্তিত্ব যিনি ফিল্ম ইনডাস্ট্রিকে অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছিলেন, বিদেশের সঙ্গে এদেশের সেতুবন্ধন করে আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মীলিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যজিৎ বাবুর কাজকে জানা, কাজকে বোঝাই হবে ওঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য। ওঁর অসমাপ্ত কাজকে শেষ করতে হবে। মানে আমি বলতে চাই ওঁর ছবিগুলোকে উদ্যোগ নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কেননা, আমার মনে হয় আজও ওঁর ফিল্ম সীমাবদ্ধ রয়েছে শুধু শহরে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে।

শেষ শ্রদ্ধা জানাতে চলচ্চিত্রের শিল্পীরা

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রি অজিত পাঁচা।

দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়

চলচিত্র জগতের মহান সাধক সত্যজিৎ রায়ের মহা-প্রস্থানের অন্তিম যাত্রায়

সত্যজিৎ মানুষ হিসেবে ছিলেন একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যক্তি। সবসময় তিনি কাজ করতেন। খেতে যাওয়া আর ঘুমোতে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া বাকি সমস্ত সময় তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। একটা মানুষের পক্ষে এতরকম কাজ করা যে সম্ভব তা শুধু সত্যজিৎই দেখাতে পেরেছেন। তাঁর নিজের কোন সহকারী ছিলনা। চিঠির উত্তর দেওয়া এমনকি চিঠিগুলো খামে পুরে আঠা লাগানোর কাজটা পর্যন্ত নিজে করতেন এর একটা কারন, তাঁর মধ্যে এত পারফেকশন্ ছিল যে নিজের যে কোন কাজ তা সে ছোট থেকে বড় হোক অন্যকে দিয়ে করিয়ে শান্তি পেতেন না। কারোর ওপর নির্ভর করা তাঁর পছন্দ হতো না। তাঁর একটা বিশেষ দিক যে কোন মানুষকে খুব কাছের করে নিতে পারতেন। ওনার সাথে প্রয়োজন ছাড়া বিশেষ কথাবার্তা হতোনা আমার কিন্তু বাড়ীতে ফোন করলে উনি ফোন তুলে আমার গলা শুনে বলতেন 'দেবাশীষ না?' ওনার বাড়ী গেলে প্রথম কথাটা উনি বলতেন 'কেমন আছো?' অবাক হতাম যে মানুষটাকে কতরকম জিনিস মাথায় নজর। একটা ঘটনা বলি—বড়ালে গেছেন সুটিং করতে, রাস্তায় একটি ছেলে সাইকেল নিয়ে আসছে। ওনাকে দেখে সে বলল—'আমাকে চিনতে পারছেন?' উনি দেখে বললেন—'কেষ্টনা?' অন্য কেউ হলে হয়তো সত্যিই চিনতে পারতেন না। আসলে তিনি যে সত্যজিৎ রায় একথা কখনো ভাবতেন না। 'ঘরে বাইরে'-র সুটিং করতে গেছেন চকদিঘীতে। আমার যাওয়ার কথা ছিলনা তবু আমি গিয়েছিলাম। সুটিং তখনও শুরু হয়নি। আমাকে দেখে উনি বেশ অবাক হয়ে আগ্রহ সহকারে জানতে চাইলেন আমি কি করে গেলাম? কোন ট্রেনে কিভাবে? ইত্যাদি বিষয়। ওনার কাছে কোন জিনিস (কাজের ব্যাপারে) দেখাতে নিয়ে গেলে এমন আনন্দ পেতেন মনে হতো বাচ্চা ছেলে। আমি জিনিসটা দেখাতে নিয়ে গেছি আমার থেকে ওনার আনন্দ দেখে অবাক হয়ে যেতাম। বাড়ীর সবাইকে ডেকে, হৈ হৈ করে দেখাতেন। তিনি প্রচণ্ড রসিক ছিলেন, নিজে এবং রসিক মানুষদের খুব পছন্দ করতেন। সামাজিকতা বোধও ছিল তাঁর অসীম। বাড়ীতে কেউ গেলে নিজে আগে কথা বলা, পাঠক পাঠিকাদের চিঠির উত্তর দেওয়া সব দিকে ছিলেন সজাগ। তিনি খেতে খুব ভালোবাসতেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি মূলতঃ কিশোর সাহিত্য লিখলেও বড়দের কাছেও তা ছিল সমান উপভোগ্য। মুক্তোর মত তাঁর লেখা। ১৯৬১ সালে লেখা শুরু করেন 'সন্দেশ'-এর মধ্যে দিয়ে। প্রথমে ইংরেজী ছড়া অনুবাদ করতেন পরে গদ্য লেখেন।

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে উচিৎ তার তৈরী সিনেমাকে আরও বেশী করে দেখানো। বেশী জায়গায় দেখানো। ডিস্ট্রিবিউটারদের উচিত আরও বেশী প্রচার করা। তাঁর সমস্ত চলচ্চিত্রের সঙ্গীতগুলোকে নিয়ে ক্যাসেট বার করা। তাঁর ওপর তৈরী করা তথ্যচিত্রগুলির ভি, ডি, ও ক্যাসেট করা।

—

একটি অনুষ্ঠান

সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় সাফল্য না পেয়ে নিজেদের পায়ের জোরে দাঁড়িয়ে মহিলাদের জন্য যার। দীর্ঘদিন ধরে নানান ধরনের সেবামূলক কাজ করে এসেছেন উত্তর পাড়ার 'অবকাশ' (নারী সেবা সঙ্ঘ) তাদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি উত্তরপাড়ার 'গণভবনে' 'কবি মানসে জাতীয় সংহতি' শীর্ষক একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা উদ্‌যাপিত করলেন তাদের একদশতম প্রতিষ্ঠা দিবস।

জাতীয় সংহতির উপরে বিভিন্ন কবিদের কবিতা ও গান দিয়ে সংকলিত গীতিআলেখ্য সুষ্ঠভাবে পরিবেশন করেণ অবকাশের শিল্পীরা। এছাড়া স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে শ্রুতি নাটক নিবেদন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ও শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুটি। লোকসঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে তথ্যকথিত স্বপন বসু আবার প্রমাণ করলেন তার সীমাবদ্ধতা। কেবলমাত্র 'থাকিলে ডোবাখানা' দিয়ে আসর জমানো যায় না।

অবকাশের মহিলারা প্রমাণ করলেন সেবামূলক কাজকর্ম তো বটেই, নান্দনিক অনুষ্ঠান পরিকল্পনা পরিবেশনা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সমান দক্ষ।

—

সত্যজিৎ ছিলেন গ্রেট : —চেতন আনন্দ

১৯৪৬ সাল আমার জীবনে চিরস্মরণীয়। আমার প্রথম ছবি নীচানগর কান্‌স চলচ্চিত্র উৎসবে গ্রাঁপ্রী পায়। পুরস্কারটি আমি প্রখ্যাত ইংরেজ পরিচালক ডেভিড লীনের সঙ্গে (ব্রীফ এনকাউনটার ছবি খ্যাত) একত্রে পাই। সেই সময় কোলকাতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিঠি পাই। ও তখন ডিজে কিমার বিজ্ঞাপণ সংস্থার আর্ট ডিরেক্টর। ওরা কোলকাতায় একটি ফিল্ম সোসাইটি খুলেছিল। সত্যজিত অনুরোধ করেছিল আমি যেন ওদের সোসাইটিতে ফিল্ম টেকনিকের উপর কথা বলি। নিজেকে অত যোগ্য মনে করিনি তখন। তাই কোলকাতায় যাইনি।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি রুমা গুহ ঠাকুরতা ও'র সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। ছয় ফুট লম্বা, গুরু গম্ভীর গলা, সব মিলিয়ে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সত্যজিত। ও'র চোখ দুটি আমায় বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল। দেখেই বুঝেছিলাম এ সাধারণ মানুষের চোখ নয়। এক যথার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির চোখ।

পথের পাঁচালী করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে এক নতুন মোড় দেয় সত্যজিত। ওর রবিশঙ্কর আর সুব্রত মিত্রের সংমিশ্রনে অনেক অসাধারণ কাজ করিয়েছে। বিশেষ করে পথের পাঁচালিতে বাউন্স লাইটিংএর ব্যবহার এক কথায় অনবদ্য। প্রায় এক দশক পরে ওই টেকনিক স্বর্গীয় পাল মিস্ত্রি রঙীন ফিল্ম প্রেম পূজারিতে ব্যবহার করেন।

সত্যজিতের এক বিরাট গুন ও চরিত্র অনুযায়ী শিল্পী নিত। আজকালকার হিন্দি ছবির মত ষ্টারকে কেন্দ্র করে ওর চিত্রনাট্য নয়। শিল্পীদের থেকে চমৎকার অভিনয় বার করে নিত। ওর ছবি দেখে মনেই হত না যে অভিনয় দেখছি।

ওর অনেক অবদানের মধ্যে চারুলতার শেষ দৃশ্যে ফ্রিজ শটের ব্যবহার সিনেমার ভাষায় এক নতুন দিক খুলে দিয়েছে। অবশ্য ভারতীয় সিনেমায়।

মনে পড়ে চৌষট্টি সালে কোলকাতা গেছি' হকিকতের জন্য বি এফ জে এ আনতে। গ্র্যাণ্ড হোটেলে সত্যজিতের সঙ্গে দেখা। হেসে বলল, চেতন হকিকত দেখলাম। দুর্দান্ত ভিসুয়াল। কিন্তু কোন গল্প খুঁজে পেলাম না। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, হকিকত গল্প না। মোজামত ঠাণ্ডা আর সত্য। শুনে খুব উপোভোগ করেছিল ও।

এই বছর আমার পঁচাত্তর বর্ষপূর্তিতে ও আমায় শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিল আমি যেন আরো ক্রিয়েটিভ হই। ভারতীয় চলচ্চিত্রতে আমার অবদানকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। অভিভূত হয়েছিলাম। সামনে পেলে ওকে জড়িয়ে ধরতাম।

আজ সত্যজিৎ নেই। কিন্তু চলচিত্র প্রেমিকরা ওকে মনে রাখবে একজন গ্রেট মেকার হিসেবে। আমি ওর মহান আত্মার শান্তি কামনা করি। অনুলিখন : রঞ্জন দাসগুপ্ত

রঞ্জন দাসগুপ্ত

ইতিহাস—সত্যজিৎ

মুক্তি চক্রবর্তী

বাংলার আর এক গর্ব আজ হল ইতিহাস।
ইতিহাস শিল্পকলার, ইতিহাস সঙ্গীত বোধে
ইতিহাস সাহিত্য, সর্বোপরি ইতিহাস চলচ্চিত্রে।
এ ইতিহাস শুধু ভারতের নয় সারা বিশ্বের—
চলচ্চিত্রের ইতিহাস আজ অসম্পূর্ণ অসার্থক
সত্যজিৎ বিহনে।
তোমার যাত্রা-পথের পাঁচালীর অবসান হল আজ।
আগন্তুকের মত মৃত্যু এসে বাঙ্গালীকে করে গেল
নিঃস্ব, রিক্ত শোকমগ্ন।
সভ্যাতা সংস্কৃতি যতদিন থাকবে টিকে
তুমিও থাকবে উজ্জ্বল জোতিস্কের মত।
উত্তরকালের মূল্যায়নে—নতুন নতুন মাত্রা যোগে
তুমি হবে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্বমানসে।

— ✗ —

With Best Compliments From :

POWER CABLE INDUSTRIES

আপনার ও সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য

আপনি চান উচ্চতর শিক্ষায়, স্বাচ্ছন্দে ও ভালবাসায় আপনার সন্তান বড় হয়ে উঠুক।

কিন্তু তার জন্য দরকার সঞ্চয়ের। আর এই সঞ্চয় প্রবনতা শিশুর মনেও ছাপপড়ে।

সুতরাং আজই তার সুচনা হোক ভেরোনার মাধ্যমে।

ভেরোনা কমার্শিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট কোম্পানি লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : শহীদ ক্ষুদিরাম বোস রোড,

পোঃ ও জেলা মেদিনীপুর-৭২১ ১০১

হেড অফিস : ৪৫/১, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড,

৪র্থ তল, কলিকাতা-১৬

শব্দজব্দ

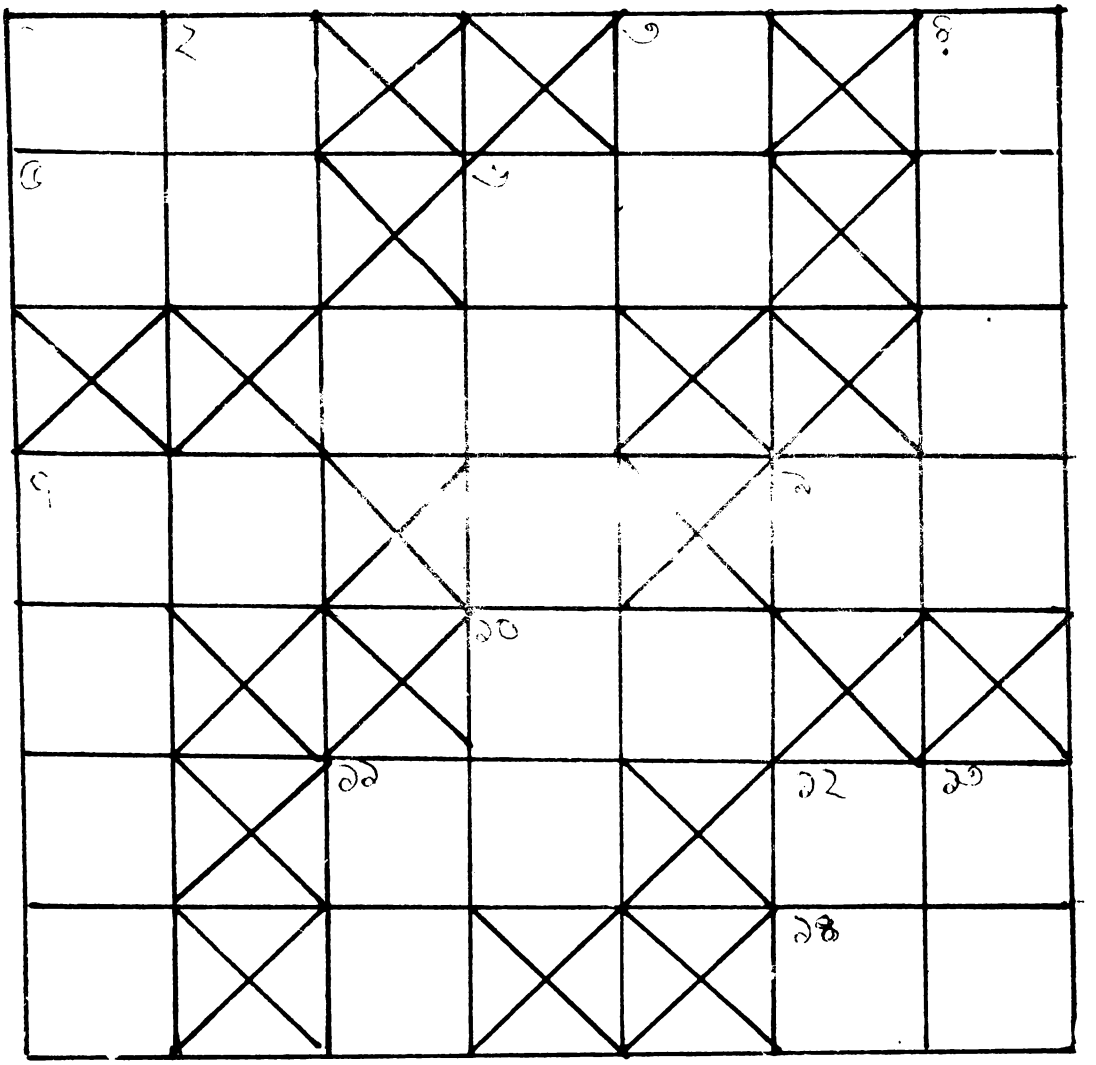

পাশাপাশি ঃ ১। তিলুবাবু ৫। গ্যাংটকে নিহত ভদ্রলোকের নামের প্রথমাংশ ৬। কৈলাসে পাওয়া গিয়েছিল লালমোহনবাবুর আকাঙ্ক্ষিত এই জিনিষটি ৭। ফেলুদার চিরশত্রু মেঘরাজ নিজের নামের সাথে আজকাল জটায়ুর নামের এই মিলটিই খুঁজে বের করেছিল, ৮। ওল্টালে এমন এক তীর্থস্থান যেখানে ফেলুদার সবচেয়ে লেমথাড়া করা উপন্যাসের সূত্রপাত ৯। —— ছাড়া খাবটা কি? ১০। কলকাতার এই বাজারে যে রহস্যের সৃষ্টি হয় তার সমাধানে ফেলুদাকে ছুটতে হয়েছিল গ্যাংটকে, ১১। গোয়েন্দা ফেলুদার প্রথম উপন্যাসের কুখ্যাত ব্যক্তিটির নামের প্রথমাংশ, ১২। সত্যজিতের চলচ্চিত্রের অমর চরিত্র। ১৪। ক্যাপ্টেন স্পার্ক।

উপর নীচ ঃ ১। গোয়েন্দা ফেলুদার উপন্যাসে খুন হল এই মৃৎশিল্পী। ২। ওল্টালে সত্যজিতের গল্পের এই ভদ্রলোকের সাথেই দেখা হয় মঙ্গলগ্রহের অ্যাং-এর। ৩। কৈলাসে নিহত ভদ্রলোকের পদবি। ৪। যত কাণ্ড এখানেই। ৬। রক্তবরণ মুক্তকরণ। ৮। সত্যজিতের গল্পে আছে এই ছেলেটির সাথে রাক্ষসরূপী মাস্টারের কথা। ১১। সিধু জ্যাঠার কাছে এরই সন্ধানে যেত ফেলুদা। ১২। শার্লক হোমস ফেলুদার যা। ১৩। এই চলচিত্রে ফুটে উঠেছে একটি শিশুর নিদারুণ একাকিত্ব।

—০—

সমাধান

পাশাপাশি ঃ শঙ্কু ৫। শিব৬। লাস ৭। লাল ৮। কাশী ৯। মুণ্ডু ১০। হগ ১১। বন ১২। দুর্গা ১৪। পিকু।

উপরনীচ ঃ ১। শশি ২। বঙ্কু ৩। বোস ৪। কাঠমাণ্ডু ৬। লালমোহন ৮। শীবরাম ১১। বই ১২। গুরু ১৩। পাকু।

মৌসুমী বসু

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৯০) মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে। ছবি ঃ জে. পি মিত্র

বংশী চন্দ্রগুপ্ত-র সঙ্গে। ছবি ঃ সুনীল মিত্র-র সংগ্রহ

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব ;
বার্গম্যান (পিছনের সারিতে),
সেলজনিক
(সামনে মাঝখানে)
ছবি ঃ পারিবারিক সংগ্রহ

বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের কাছ থেকে 'দেশিকোত্তম' সম্মান গ্রহণ

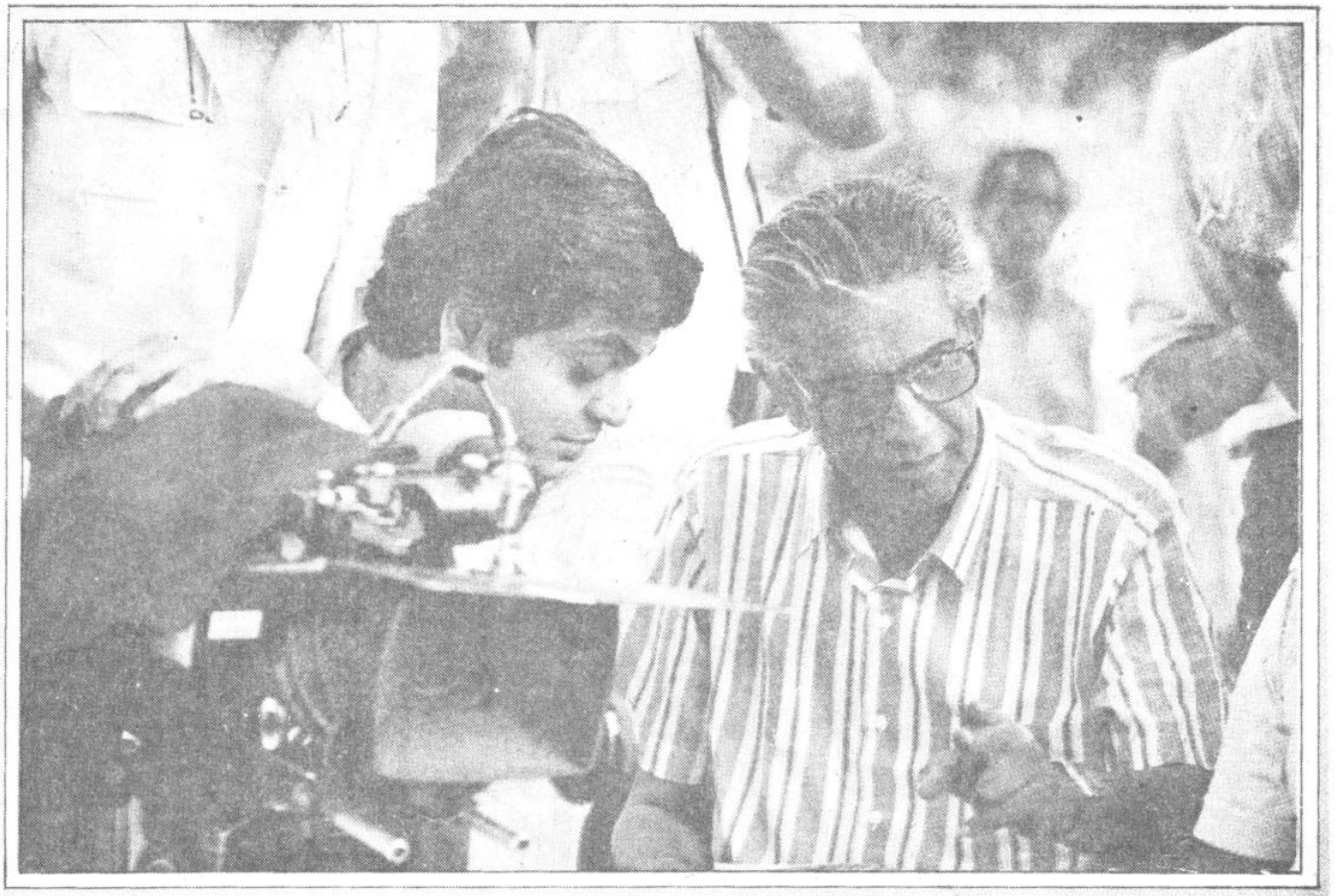

'আগন্তুক' : শুটিং-এর প্রস্তুতি। ছবি : হীরক সেন

'আগন্তুক' : কলকাতা ময়দানে শুটিং। ছবি : হীরক সেন

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'
ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে
রিহার্সাল।
ছবি ঃ দুর্গা মিত্র-র সংগ্র

'অভিযান'
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের
সঙ্গে রিহার্সাল।
ছবি ঃ
দুর্গা মিত্র-র সংগ্রহ।

'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্র, টাইটেল লেখার কাজ। ছবি ঃ হীরক সেন